

গান্ধী-অনুসরণ গ্রন্থমালা—১

বিশ্বমানব ও গান্ধীবাদ

(ওয়াই, জি, কৃষ্ণমূর্তি)

প্রভাত বসু কর্তৃক অনূদিত

মাননীয় ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের মুখবন্ধ ও বিহারের গভর্ণর
শ্রীমাধবহরি আনের ভূমিকা সংবলিত



কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা



প্রথম প্রকাশ
কার্তিক, ১৩৫৬

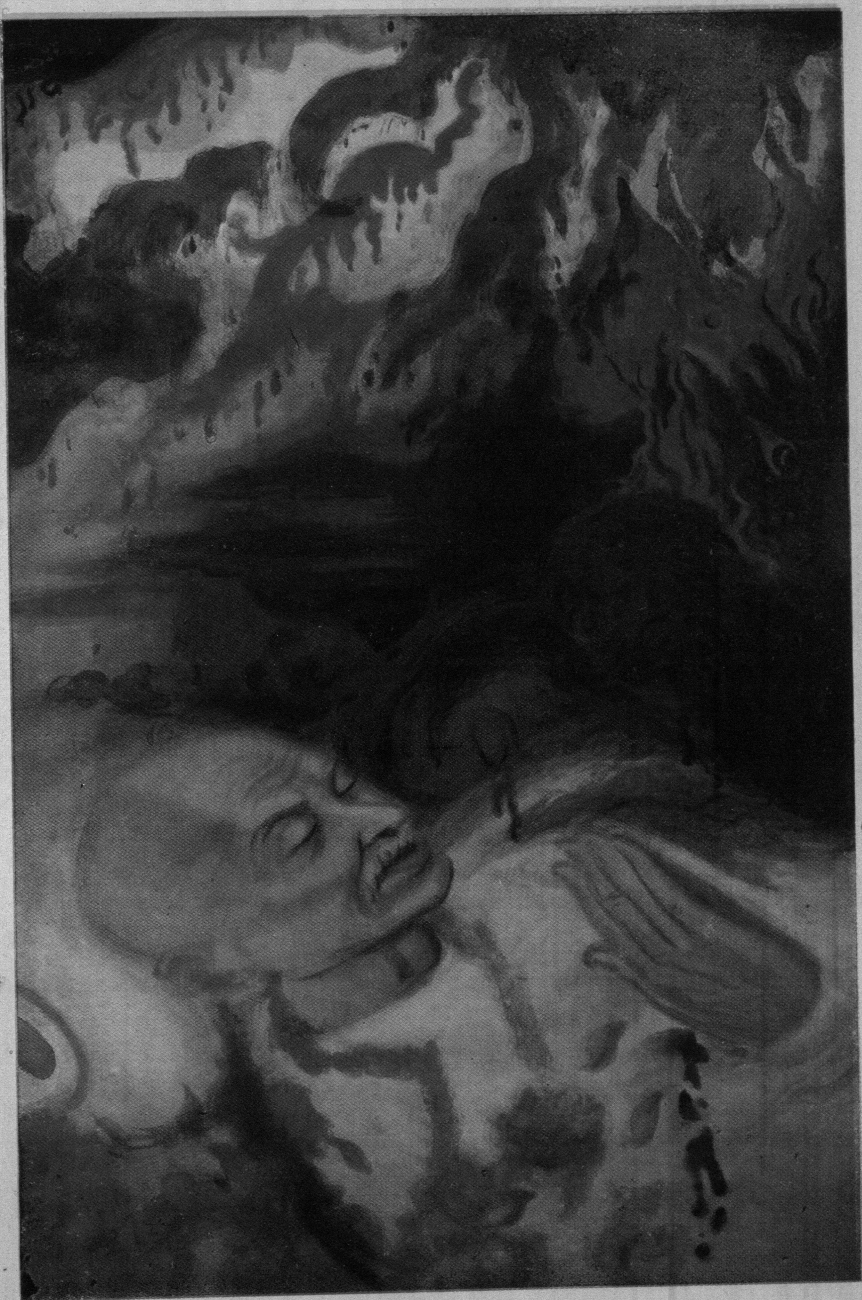
শ্রীসরোজনাথ সরকার এম. এ., বি. এল. কর্তৃক ১৫ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও শ্রীপতি প্রেস, ১৪, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস কর্তৃক মুদ্রিত।



—সূচীপত্র—

১।	মুখবন্ধ—ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ	...	৵০
২।	ভূমিকা—শ্রীমাধবহরি আনে	...	।৵০
৩।	বিশ্বমানব ও গান্ধীবাদ	...	১
৪।	বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আবেদন	....	২৪
৫।	দ্বিতীয় খণ্ডের মুখবন্ধ—শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহেরু		৩৩
৬।	গান্ধীবাদ জয়ী হইবে	...	৩৭
৭।	'গান্ধী ইন্‌ষ্টিটিউট্'	...	৫২





প্রভাত বসু রচিত

গান্ধীজী (গীতিনাট্য)

গান্ধীজীর বাণী

গান্ধীজীর গল্প

বিদেশীর চোখে গান্ধীজী

—সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়—

বিভিন্ন কবিরা মহাত্মা গান্ধীর প্রতি যে শ্রদ্ধার্ঘ্য রচনা করিয়াছেন

তাহার সংকলন

—গান্ধীনামা—

প্রভাত বসু সম্পাদিত

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

—মুখবন্ধ—

আমি ওয়াই, জি, কৃষ্ণমূর্তির অন্য কয়েকটি রচনার সহিত জনসাধারণের পরিচয় করাইয়া দিয়াছি। তিনি বহু পুস্তকের লেখক, অথচ একই বিষয়ে তাঁহার বিভিন্ন রচনা পাঠকদের আনন্দ ও শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছে। ইহার কারণ, তাঁহার মধ্যে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তি ও জাগ্রত মেধার সহিত উদার সহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টির মিলন ঘটিয়াছে। এক কথায় যাহাকে 'গান্ধীবাদ' বলা যায় তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য তিনি তাঁহার গভীর বিশ্লেষণ-প্রতিভা ও ব্যাপক অনুভূতিকে সম্পূর্ণ নিয়োগ করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী সর্ব্বদাই বলিতেন, তিনি কোনো 'মতবাদের' প্রতিষ্ঠাতা নহেন, যে শাশ্বত সত্য যুগে যুগে সকল ধর্মোপদেষ্টা, অবতার, কবি ও দার্শনিকগণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন—তিনি তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। তবুও, বিশ্বের চিন্তাভাণ্ডারে তাঁহার নিজস্ব দান অতি বিরাট্। যুগ যুগ ধরিয়া যে শিক্ষা প্রচারিত হইয়াছে, তিনি শুধু তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া তৃপ্ত হইতেন না। সেই সত্য তিনি নিজের জীবনে পালন করিতেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে উহা পালন করিবার জন্য উপদেশ দিতেন। তাঁহার জীবন-দর্শন কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে চর্চ্চার বস্তু নহে। ইহাকে শুধু মস্তিষ্কের এক প্রকার সহজ ব্যায়ামও বলা চলে না। ইহা জীবনের একটি অত্যন্ত বাস্তব ব্যাপার; পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই আদর্শ দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, জীবনের প্রতি মুহূর্তে পালন করিতে হইবে। ইহার প্রয়োগ শুধু ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ নহে;—ব্যক্তিগত বা সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মানবজীবনের সকল অবস্থাই সেই সত্যের প্রয়োগ-ক্ষেত্র। যুবক বা বৃদ্ধ, শক্তিমান্ বা দুর্ব্বল, ধনী অথবা দরিদ্র, বস্তুতঃ সকল দেশের সকল জাতির সকল স্তরের নরনারীর পক্ষে সত্যাগ্রহের চিরসহায় বিশ্বজনীন অস্ত্র—সুন্দরতর শব্দের অভাবে যদি আমরা অস্ত্র কথাটিই ব্যবহার করি—সমভাবেই লভ্য। পিতাপুত্র, স্বামী-স্ত্রী, ভ্রাতা এবং বন্ধুদের পারিবারিক সমস্যায় ইহা যেমন কার্যকরী তেমনি বিভিন্ন দল, শ্রমিক-ধনিক, চাষী-জমিদার, শাসক-শাসিত প্রমুখ পৃথক্ শ্রেণী যতদিন বর্তমান আছে—তাহাদের বৃহত্তর সমস্যার

সমাধানেও এই সত্যের সহায়তা প্রয়োজন। ইহা রাষ্ট্র এবং উহার অধিবাসী, এমন কি রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব নিরসন করিতেও সক্ষম। মহাত্মা গান্ধী নিজ জীবনে উপরোক্ত প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সেই আদর্শের বাস্তব প্রয়োগ দেখাইয়া গিয়াছেন। অতএব তাঁহার দর্শন শুধু বুদ্ধি দ্বারা আয়ত্ত ও পরিপাক করিলে চলিবেনা, সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে উহা পালন করা প্রয়োজন; এক ব্যক্তি স্বীয় জীবনে ইহা প্রয়োগ করিতে যতখানি অসমর্থ হইবেন ঠিক ততখানি গান্ধীবাদের বিভিন্ন দিক্ তাঁহার নিকট দুর্ব্বোধ্য থাকিয়া যাইবে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে প্রয়োগের পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে মূল তত্ত্বগুলি সম্পর্কে বুদ্ধিগত ধারণা থাকা প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধী সর্ব্বদাই শ্রোতাদের বলিতেন, তিনি বলিতেছেন বলিয়া তাহারা যেন কোনো সত্যকে গ্রহণ না করে—নিজেদের যুক্তির নিকট গ্রহণীয় না হইলে উহাকে বর্জ্জন করিতে হইবে। অধিকারী যত বড়ই হউন না কেন, তিনি তাহাকে স্বীকার না করিয়া সর্ব্বদাই যুক্তির সাহায্য লইতেন। তাঁহার উপদেশ জাতির শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের যুক্তিবাদী মনকে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়াই তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—তাঁহার এই প্রভাব যুগ যুগ ধরিয়া বর্তমান থাকিবে। সুতরাং তাঁহার উপদেশের পুনরাবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে। অবশ্য সর্বাপেক্ষা ভাল উপায় গুজ্‌রাতী, হিন্দী, ইংরাজী প্রভৃতি নানা ভাষায় বহু পুস্তকে মুদ্রিত গান্ধীজীর নিজের বাণী পাঠ করা। কিন্তু নানা স্তরের অনুসন্ধানী ও পাঠক আছে। যাঁহারা বিশেষভাবে এইগুলি অধ্যয়ন করিয়াছেন, প্রতি স্তরের জন্য সহজবোধ্য ভাব ও ভাষায় সেইগুলি প্রকাশ করা তাঁহাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং সৌভাগ্যও বলা চলে। ওয়াই, জি, কৃষ্ণমূর্তির রচনাটি এই প্রকারের; আমি আশা করি ইহা যে উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে তাহা সিদ্ধ হইবে।

২৪. ৩. ৪৯. (স্বাঃ) রাজেন্দ্রপ্রসাদ

জিরাদী, সারণ

—ভূমিকা—

কৃষ্ণমূর্তি একজন বিশেষ চিন্তাশীল ব্যক্তি—ভারতীয় পাঠক-পাঠিকাদের নিকট তাঁহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। চিন্তার পুষ্টিকর খাদ্য-সংযুক্ত এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট তাঁহার গভীর বিশ্বাসের শক্তি এবং অনুভূতির উচ্ছ্বাস আনিয়া দিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন। কৃষ্ণমূর্তি তাঁহার কর্তব্য সুন্দরভাবেই সম্পন্ন করিয়াছেন; তিনি সফলকাম হইবেন কিনা তাহা এখন লক্ষ লক্ষ মানুষের উপরই নির্ভর করিতেছে। অবশ্য লিখিত বাক্য অনুভূতি দূরে থাক্, চিন্তাকেও সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিতে পারে না; এই অসুবিধা থাকিয়াই যাইবে।

আমার মনে হয়, কৃষ্ণমূর্তি মহাত্মা গান্ধীর সকল উপদেশ সংক্ষেপে একটি ত্রিকোণাকারে প্রকাশ করিয়াছেন; যখন আত্মার রূপান্তর ঘটে তখনই জগতের পুনর্জন্ম লাভ হয়—এই মূল বিশ্বাসের ভিত্তির উপর বিশ্ব-দৃষ্টি, সত্যের শক্তি ও অহিংসা এই তিন বাহু লইয়া সেই ত্রিকোণটি দাঁড়াইয়া আছে।

আমার মতে গান্ধীজীর বৈশিষ্ট্য অন্য কিছু অপেক্ষা তাঁহার নিম্নোক্ত গভীর বিশ্বাসের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়; যাহা সত্যই কল্যাণকর তাহা সকল অবস্থাতেই কল্যাণপ্রদ—এক জনের পক্ষে যাহা ভাল সর্বজনের পক্ষে তাহাই হিতকারী—ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাহা মঙ্গলদায়ক সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তাহাই উপকারী। জীবনের প্রতিটী ব্যাপারে, এমন কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সত্য ও অহিংসার আদর্শ প্রয়োগে তাঁহার যে সাহস—ইতিহাসে তাহার তুলনা মিলে না। আমার মনে হয় কৃষ্ণমূর্তির রচনার বিষয়বস্তু এই যে, বিশ্ববাসী সকলের সেই সাহস থাকা প্রয়োজন এবং তাহাদের গান্ধীজী-প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা উচিত।

'গান্ধীবাদ কোনো উন্নাসিক তত্ত্বকথা নয়, ইহা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-দর্শন'—আমি নিশ্চিত জানি যাহারা গান্ধীজীর উপদেশাবলী বিচার করিয়া পাঠ করেন তাঁহারা লেখকের এই উক্তির সহিত একমত হইবেন। গান্ধীবাদ যে বিশ্ব ইতিহাসের একটি চালক-শক্তি হইয়া উঠিবে ইতিমধ্যেই তাহার আভাষ দেখা যাইতেছে। ইহা অচিরে মুক্ত এবং সমন্বিত জগৎ সৃজন করিবে—আমরা এই আশাই করিব।

গভর্ণরের ছাউনী, বিহার — (স্বাঃ) এম্, এস্, আনে
৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ — বিহারের গভর্ণর



বিশ্বমানব ও গান্ধীবাদ

জগৎকে পরিশুদ্ধ করিতে হইলে প্রচণ্ড অলোড়নের প্রয়োজন হয়; মহৎ সত্যের সম্মুখে আপনা হইতে মাথা নত করিবার শিক্ষা আজিও তাহার হয় নাই। এমন কি বর্তমান কালের দুঃখ হইতে আংশিক মুক্তি কামনা কবিতেও সে অক্ষম। অভিজ্ঞতার শিক্ষাকে গ্রহণ করিবার জন্য যে নৈতিক প্রচেষ্টা বা দুর্জ্জয় সংকল্পের প্রয়োজন—তাহাও নাই। আধুনিক যুগের মানুষ •বিভিন্ন ভাবধারার গতিকে উপলব্ধি করিতে পারে নাই; তাহার চিত্তে শুধু কালের বিকৃতির চঞ্চল প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্তমান যুগে আমরা বিভিন্ন মতবাদের শুষ্ক পত্ররাজির আলোড়ন লক্ষ্য করিয়াছি। একমাত্র হৃদয়ের ক্ষেত্রে শাশ্বত বস্তুর সন্ধান মিলিয়াছে। সর্বধ্বংসী যুদ্ধ পুরাতনের সহিত যোগসূত্রকে ছিন্ন করিয়া বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা প্রসূত সন্দেহবাদের ভয়াবহ রূপটিকে প্রকট করিয়াছে; আমরা বস্তুতান্ত্রিক নীতির আলোকোজ্জ্বল শিখরের পরিবর্তে মৃত্যুর ঘনকৃষ্ণ গহ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি। মনে হয় অন্তরের সংগ্রাম ক্ষণিকের—মানুষের স্বভাবসিদ্ধ রক্ষনশীলতা বিরোধী শক্তি অপেক্ষাও অধিকতর বিপজ্জনক। ইতিহাসের রথচক্রে চিরস্থায়ী নৈতিক আবেগের শক্তিযোজনা না করিয়া মানবজাতি মুক্তি ও কৃষ্টিকে আণবিক অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল হইয়া উঠিতে দিয়াছে।

নূতন বিধানের রূপটি ক্রমেই পরিস্ফুট হইতেছে। অবশ্য ইহা বিষাক্ত আবহাওয়ার তিক্ত নিষ্কাশন ব্যতীত আর কিছু নহে। কল্পনার চিত্রপটে এই নূতন আলোক বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের নব আশাকে রূপায়িত করিয়া তুলিবে এমন সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। রেখা ও রঙের

আড়ম্বর থাকা সত্ত্বেও ইহাকে পরাভূত ফ্যাসিষ্ট আদর্শের স্বীকৃতি বলিয়া মনে হয়। এখনও মানুষ তৃতীয় মহাযুদ্ধের ঘনায়মান ছায়াতলে দাঁড়াইয়া শঙ্কায় কাঁপিতেছে।

সময় চলিয়া যায়, তবু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁহাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস দুইটি ছাড়িতে পারিতেছেন না—ভীতিপ্রদ মারণাস্ত্র এবং দলগত প্রভাব। তাঁহাদের এই ভ্রান্ত পথে চলার ফলে বর্তমান পরিস্থিতি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। দলের স্বার্থসিদ্ধির নিকট বিশ্বমৈত্রীকে বলিদান দিবার আগ্রহ এবং ইতিহাসের শক্তিকে অস্বীকার করার মধ্যেই আসন্ন সংকটের বীজ নিহিত রহিয়াছে। ফলে, আমাদের বাক্যগুলি তাহাদের মূল অর্থ হারাইয়া ফেলিয়াছে ; নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে দুর্ব্বল বিশ্বাসের ছাপ সুস্পষ্ট।

আবার যদি আলোক নির্বাপিত হয় মানুষকে কম খাইয়া বেশী কাজ করিতে হইবে, খাদ্যের পরিবর্তে বন্দুকই হইবে তাহার কাম্য এবং বিরক্তির সহিত নিজেদেরই প্রস্তুত ঔষধ গলাধঃকরণ করিতে হইবে। সেই অনিশ্চয়তা ও বিদ্বেষের ঝঞ্ঝার মধ্যে জীবনের সার বস্তু বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব এই আশঙ্কা সম্পর্কে সচেতন করিয়া দিবার শক্তির মধ্যেই বর্তমান সভ্যতার উত্থান বা পতন নির্ভর করিতেছে।

কিন্তু স্বভাবতঃই মানুষ আত্মিক শক্তিকে অবজ্ঞা করে। ইহার কারণ—গূঢ় নীতি-তত্ত্বের সন্ধান সত্যই কঠিন এবং সুদুর্লভ। ব্যবসায়ের অসামান্য সফলতার আশ্বাসও ইহার মধ্যে নাই। যে মানুষ সমসাময়িক কালের মহৎ কীর্তি সকল সংঘটিত হইতে দেখে এবং উহার স্পর্শ লাভ করে তাহারা কেমন করিয়া যুদ্ধকামী ভাবধারার বিবর্ণ বহিরাবরণের প্রতি আকৃষ্ট হয়, ভাবিতে আশ্চর্য লাগে। বস্তুতঃ এই প্রবৃত্তি ধ্বংসের সূচনা করিয়াছে।

বর্তমান কালের অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই সত্যকে বিনষ্ট করিবার চঞ্চল প্রবৃত্তি বর্তমান। এই যুগে চিন্তা

এবং বিচারের দায় হইতে মানুষ নিষ্কৃতি পাইয়াছে বলিয়া অর্থহীন লক্ষ্য ও অশোভন অকৃতজ্ঞতার মধ্যে সে আনন্দ লাভ করে। গান্ধীজী ইতিহাসের নিকট নৈতিক মূল্য স্বীকারের আহ্বান জানাইলেন—শুধু এইটুকুই বর্ত্তমান কালের গৌরব করিবার বিষয়। না ভাবিয়া নানা বিধান গ্রহণের প্রবৃত্তি হইতে গান্ধীজী মানুষকে মুক্ত করিয়াছেন এবং বিপদ হইতে রক্ষার জন্য সভ্যতার চারিদিকে গণ্ডী রচনা করিয়া দিয়াছেন। যখন তিনি ইতিহাসের উদ্দেশ্যের সহিত পূর্ণ ঐক্যের সামঞ্জস্য বিধানের কঠিনতর কর্তব্যে নিযুক্ত হইলেন, সমগ্র জগৎ যেন আত্মবলিদানের বেদনা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিল।

গান্ধীজীর আত্ম-বলিদান আধ্যাত্মিক রাজ্যের এক প্রচণ্ড আহ্বান এবং ইহাকে স্বীকার করিবার শক্তির মধ্যেই মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। সুখের বিষয় এই মহান্ আত্মদানই দিকে দিকে গবেষণা ও আলোচনার তরঙ্গ তুলিয়াছে। মনে হয় পরম অনুশোচনার পর মুমূর্ষু পৃথিবী গান্ধীজীর নবাবিষ্কৃত আত্মিক সম্পদকে গ্রহণ করিবে। যদি ভারতবর্ষ তাঁহার আদর্শলোকের আরও নিকটবর্ত্তী হইতে পারিত তাহা হইলে জগতে নৈতিক নিষ্ঠার পুনরভ্যুত্থান ঘটিত। ভারত এখনও পর্যন্ত এই দিকে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই; অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ না করিলে গান্ধী-অনুসৃত সত্যগুলির সমগ্র রূপ তাহার নিকট প্রতিভাত হইতে পারে না।

গান্ধী-নীতিকে আয়ত্ত করা এবং বিশ্বাসীর সহিত একযোগে তাহার সুফল উপভোগ করাই নূতন যুগের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর কর্তব্য। গান্ধীবাদের সৌন্দর্য, পরম অনুভূতি এবং তত্ত্ব যে কোন যুগের পক্ষে মহা আকর্ষণের বস্তু। গান্ধীবাদকে অত্যন্ত সহজেই অস্বীকার করা নীতিধর্ম্ম, বিবেক-বুদ্ধি এবং ঐতিহ্যের বিপরীত। এই কারণে, আজ আমরা উহার প্রতি মিথ্যাচারণ করিলেও জগৎ একদিন এই সত্য নিশ্চয় গ্রহণ করিবে।

গান্ধীজীর চিন্তাধারার প্রভাব বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়াছে

এবং হইতেছে। সকল প্রকার নির্যাতন ও পাশবিকতার প্রতিবাদ-রূপে ইহা ভীতিপ্রদ আণবিক বোমার একমাত্র প্রতিষেধক। অণুকে খণ্ড খণ্ড করার ফলেই বিজ্ঞান ও মানব-ধর্মের মধ্যে পূর্ণ বিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়াছে। ঘটনাস্রোতের নিকট পরাভূত হওয়ায় মানুষের অন্তরে আজ নিরাশা ; রাজনীতিগত সমাধানের আকাঙ্খা তাহাকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে।

যুগের রাজনৈতিক এবং সামাজিক ভাবধারার অর্ধেক অংশও পরিবর্তিত করিতে না পারিলে বিজ্ঞান এবং জীবনের বৈষম্য ক্রমশঃই প্রকট হইয়া উঠিবে। আণবিক অস্ত্র ইতিমধ্যে রাজনীতির ক্ষেত্রে নূতনতর হিংসা এবং বিবর্তন-ধারার সম্মুখে প্রলয়ঙ্কর ভীতি উপস্থাপিত করিয়াছে। যদি শক্তির উপর নীতির শাসন না থাকে তবে পৃথিবীতে কেন্দ্রীভূত নির্যাতন সুরু হইয়া যাইবে।

ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের বিভিন্ন ধারাগুলিকে নূতন ভাবে সুসংবদ্ধ করাই বিশ্ব-ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা। বিকিনীতে আণবিক বোমার পরীক্ষা ও মৈত্রী প্রস্তাব, এই দুই চরম ব্যবস্থা বিপরীতমুখী মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। উহা জাতিসমূহকে সংকটের গভীর গহ্বরে ঠেলিয়া দিতেছে। যাহারা গত কয়েক বৎসর ধরিয়া শক্তিশালী জাতিগুলির কলা-কৌশল লক্ষ্য করিয়াছে তাহারা আরেকটি বিশ্ব সংঘর্ষের আভাষ স্পষ্টই দেখিতে পাইবে। বিভিন্ন জাতি সর্বনাশা দ্বন্দ্বের লেলিহান শিখার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে।

২

তবু ইতিহাসের এই পট পরিবর্তনের অন্তরাল হইতে নৈতিক আদর্শ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। গত ত্রিশ বৎসরের ঘটনাবলী সমসাময়িক রাজনৈতিক মতবাদের ভ্রান্তি এবং উদ্দেশ্য-বৈষম্য সপ্রমাণ করিতেছে। আভ্যন্তরীণ বিধি ব্যবস্থায় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশ্বশান্তিকে জোর করিয়া দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছে।

বর্তমান শতাব্দীতে চারিটি প্রধান ভাবরূপ দেখা যায়—ফ্যাসিজম্, কমিউনিজম্, প্লুটো ডেমোক্রাসী এবং গান্ধীবাদ। এর মধ্যে ফ্যাসিজম সর্ব্বাপেক্ষা অন্তঃসারশূন্য। সমাজের অন্ধ শক্তিগুলিকে একত্র করিয়া সকল পবিত্রতা ও উন্নতিকে জামার একটি রঙের মধ্যে রূপায়িত করাই ফ্যাসিজমের রীতি। ইহার চোখে বিশ্বসাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন, এবং বিপদ বরণ করিয়াও শক্তি সাধনা ইহার স্বীকৃত নীতি। ইউরোপকে নাৎসী সংগঠনের মধ্যে আনিবার প্রচেষ্টায় এই মতবাদ স্বীয় ঔষধ অধিক মাত্রায় সেবন করিয়া আত্মঘাতী হইয়াছে। প্লুটো ডেমোক্রাসী যুদ্ধের পরিণত অবস্থায় প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু শান্তির সময় নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আসন্ন আলোড়নকে অস্বীকাব কবিয়াও ইহা কমিউ-নিজমকে গ্রহণ করে। স্মৃতির বীক্ষণ আজ অস্পষ্ট, তাই রুশ বিভীষিকাকে গ্রহণের দ্বারা মিলন-সংঘ স্থাপনের কথা ইহা প্রচার করিতেছে। দুর্ব্বল প্রতিবেশীর রক্তক্ষরণের পূর্বেই স্টালিন এবং দলীয় ব্যক্তিরা ইতিহাসের একটি ভ্রান্তিকে কার্যে পরিণত করিয়াছেন। বেদনাবিহ্বল এই বর্তমান যুগে নূতনতর শংকা জীবনকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে; সর্ব্বাঙ্গীন বিশ্বাসঘাতকতা তৃতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা করিতেছে।

জগৎ গান্ধীজী প্রচারিত তত্ত্বকথা ও প্রতীকের মনোহর সৌন্দর্য সম্পর্কে চির-সজাগ। আধুনিক পরিস্থিতির সহিত এই ভাব কতদূর সামঞ্জস্যপূর্ণ আমাদের সে সম্পর্কে বিচার করিতে হইবে। অন্যথা ইহার কোন বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না এবং উহা আমাদের ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিবে।

গান্ধীজী যাহা চিন্তা করিয়াছেন বা তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষকে সেই সত্যের ঘনসান্নিধ্যে আনিয়াছেন। মূল অনুভূতির প্রতি নিষ্ঠা এবং স্বীয় চিন্তাকে সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া

দেওয়ার পদ্ধতিই গান্ধী-দর্শনের প্রধান ভিত্তি। তাঁহার সংযত ও স্বতঃস্ফূর্ত বাণী নূতন অনুভূতির উদ্রেক করে। মন-গড়া মতবাদ ও অনায়াসসাধ্য বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ এই প্রভাববিস্তারকারী বাক্যগুলি। উহারা কুসংস্কারকে পরাভূত করে।

আমাদের এই যুগ ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়াই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এখন প্রাণপ্রিয় গান্ধী-আদর্শকে সংরক্ষণ ও প্রচার করিতে হইবে। উহা জয়লাভ করুক ইহাই আমাদের কাম্য। তর্ক উঠিতে পারে যে এই প্রকার মনোভাব কালোপযোগী নহে। কারণ আমরা লক্ষ লক্ষ নিরপরাধী মানুষকে আধুনিক কালের বর্বরদের আঘাত মাথা পাতিয়া লইতে বাধ্য করি। আমরা কঠিন হইতে কঠিনতর আঘাত হানিবার জন্য ক্রমশঃ প্রস্তুত হই। হত্যাকারীর দল রক্তাক্ত দেহে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পশ্চাদপসরণ করে। ইহা অত্যন্ত পরিচিত ইতিহাস, অহিংস নয়—রক্ত-কলুষিত ইতিবৃত্ত। যুগপৎ রণ-প্রবৃত্তি এবং অহিংসার প্রতি নিবিড় নিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া ভারতবর্ষের পক্ষে কেমন করিয়া সম্ভব ? ইহা কি দ্বিখণ্ডিত সত্তাকে সৃষ্টি করে না ? আক্রমণ প্রতিরোধার্থে অস্ত্রই গ্রহণ করুক বা রণপ্রিয়তাকে জাগরূক রাখুক, ইহা জাতির মানসপটে অঙ্কিত অহিংসার রূপটিকে বিকৃত করিয়া দেয়। নীতির এই দ্বন্দ্বের ফলে অহিংসার প্রতীকগুলি শুধু দোকানীর পঞ্জিকার মধ্যে জীবন্ত হইয়া থাকে। গান্ধীজীর মতে জাতীয় জাগরণ আত্মিক শক্তির উপর নির্ভর করে ; বর্তমান কালের শাসকরা বৈদ্যুতিক বা অশ্বশক্তির পরিমাপে জাতির গতিবেগ নিরূপণ করিয়া থাকেন। অবশ্য এই আভ্যন্তরীন বৈষম্য অহিংসার আদর্শ পালনের মূল শক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারে না। একটি জাতি ঐতিহাসিক মূহূর্তে বিশ্বাসের উচ্চশিখরে এবং নব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমাদের শাসকবৃন্দ মাত্র রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের

পুনর্গঠন ব্যতীত অন্য কিছুই করিতে পারিলেন না। তাঁহারা গান্ধী-অনুসৃত আদর্শের বাস্তব রূপ দিতে পারেন নাই। কংগ্রেসের মুখপাত্র-রাও দায়িত্ববিহীন উৎসাহ প্রদর্শন করেন। আমরা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি উঁহারাই নৈরাশ্যবাদ ও অন্ধ গোঁড়ামির জন্য দায়ী। গান্ধীজী-প্রচারিত সত্যের অর্থকে বিশ্বের পটভূমিতে বিস্তার করিবার বিশেষ কোন প্রচেষ্টাই হয় নাই।

পূর্বে বলা হইয়াছে, গান্ধীজীর আত্মবলিদানের মধ্যে ঘটনা-পরম্পরা এবং মানুষের এক নব-অভিযানের সূচনা—দুইই নিহিত আছে। পৃথিবীর কর্মধারার উপর ইহার কি প্রভাব এখন তাহার পরিমাপ করা কঠিন; সকল সমস্যার সমাধানে এই অসমসাহসিক নীতির কার্যকারিতাও এখন পর্যন্ত সপ্রমাণ করা হয় নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মানবজাতি বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার মৈত্রীর মহা বাণীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবে। সেই নীতিকে বাস্তব ক্ষেত্রে অনুসরণ করার প্রচেষ্টা না থাকিলে এই শ্রদ্ধাঞ্জলির মধ্যে বিশেষ কোনো উপকার বা সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। বর্তমান কালের মানুষের মধ্যে শুদ্ধ হৃদয়াবেগের উত্তাপ দেখা যায় না; সকল সময় সুযোগকে গ্রহণ করিতেও সে অক্ষম। এই কারণে নৈতিক জাগরণ ও শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া সে বিনষ্টপ্রায় বস্তুতান্ত্রিকতার উপরই নির্ভর করে। ক্লান্তিকর এই কয়েক বৎসরের বীভৎস এবং নীচ আবহাওয়া সেই শোচনীয় সত্যকে প্রমাণিত করে।

স্পষ্ট কথায়, সন্দেহবাদই তথাকথিত মহত্ত্বের একটি মাত্র রূপ। ভ্রান্ত সৌন্দর্যতত্ত্বের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে মানুষের পক্ষে সত্য এবং জীবনের ব্যবধানকে দূর করা অসম্ভব। নৈতিক নিষ্ঠা বা কোনপ্রকার অতীন্দ্রীয়বাদ যে জরারই নামান্তর—এই বোধ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। তাহার মতে রহস্যবাদী বাস্তবের যথার্থ মূল্যকে অস্বীকার করে এবং অজ্ঞাতলোকে যাত্রাই জাগ্রত জনগণের লক্ষ্য বলিয়া মানে। অতএব নীতিবান্ ব্যক্তিই অবজ্ঞার পাত্র এবং

অসাধুতাই জাতির পুনরভ্যুত্থানের একমাত্র উপায়। আধুনিক মানুষের জিহ্বায় জীবনের সত্য উচ্চারিত হওয়া কঠিন, তাই উহাকে চিরতরে স্তব্ধ করিয়া দিতে হইবে।

নীতি-প্রচাবকরা বিশ্বাসবিহীন এই সকল মতবাদের কথা জানেন। অবিশ্বাসীর দৃষ্টি যে নিম্নগামী—ইহাও তাঁহারা জ্ঞাত আছেন। যতক্ষণ না রাত্রি প্রভাত হয় ততক্ষণ সে তাহার বিরূপ মতবাদের জাল বয়ন করতে থাকুক। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, দৃপ্ত নৈতিক আহ্বানই সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খাকে জাগ্রত করিয়া তোলে। এই অতি প্রয়োজনীয় নৈতিক প্রবৃত্তি না থাকিলে মানুষ ইতিহাসের মধ্য দিয়া এতখানি অগ্রসর হইয়া আসিতে পারিত না।

যন্ত্রযুগের ধ্বংস-কৌশলের সহিত পরিচিতি যে মানুষের নৈতিক সৌন্দর্য্যানুভূতিকে কিয়ৎ পরিমাণ খর্ব করিয়া দিয়াছে সেকথা আমাদের স্মরণ করা কর্তব্য। বর্তমান সংকটে দুটি ভাব আমাদের মনে গভীর বেখাপাত করে। আধুনিক জীবন স্বীয় ভাববৈষম্য ও নবলব্ধ দুঃখ সম্পর্কে সচেতন ; উহার মধ্যে সত্যানুভূতির একান্ত অভাব। বিনা দ্বিধায় বিধি-নিষেধ স্বীকার করিয়া লইবার পূর্বে জনসাধারণ সাধারণতঃ ওজর-আপত্তি করিয়া থাকে। কল্পনার অন্তর্দৃষ্টি না থাকায় সে নূতন পথে যাত্রা সুরু করিতে পারে না। মার্কা বা ছাপের উপর নির্ভরশীলতা এবং সত্য ঘটনাকে স্বীকার করিবার অনিচ্ছা—এই দুই প্রবৃত্তি মহা যুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী কালের উত্তরাধিকার। এই কুসংস্কারগুলির মধ্য দিয়া মানুষ পথ করিয়া লইতে অক্ষম। অবশ্য, আত্মোৎসর্গের প্রস্তুতির দ্বারা উপলব্ধিকে বাস্তবে পরিণত করা যায়—এই সত্য আমাদের অন্তরে প্রেরণা আনিয়া দেয়।

প্রচলিত দার্শনিক মতগুলির মধ্যে একমাত্র গান্ধীবাদই লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রতিদিন পূর্ণ সত্যের আলোকে জীবনযাপন করিতে

সক্ষম করে—এই কথা বলিলে কেহ জাতিগত অহঙ্কারের দোষে দোষী হইবেন না। সেই সত্যের দ্বারা আমাদের বিশ্বরূপের উপলব্ধি হইতেছে। ইহা অভিযান ও অভিজ্ঞতার নূতন রাজ্য উদ্‌ঘাটিত করিতেছে এবং মানুষকে অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মদানের ভূমিতে মিলাইয়াছে। এই নৈতিক প্রতিক্রিয়ার প্রধান বিশেষত্ব—বিশ্লেষণের যন্ত্রগুলির কোন বহিঃপ্রকাশ নাই, অথচ দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত স্বচ্ছ। আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার উচ্ছ্বাসকে ইহা সংযত করিয়া রাখে। ইহার নীতি মূলতঃ উদার এবং আত্মশুদ্ধিকর হওয়ায় শ্রেণীসংঘর্ষের কোনো স্থান নাই। দ্বন্দ্বমূলক নীতিবাদের বিতর্কও ইহাতে নাই। এক মহান্ সত্তার প্রতি শ্রদ্ধা ও মানবজীবনকে নৈতিক উদ্দেশ্যের সাধনক্ষেত্র করিয়া তোলাই ইহার বিশেষত্ব। সর্বোপরি, দেশপ্রেমের চেতনা ও মৈত্রীর দৃষ্টি সর্বত্র ছড়াইয়া দিবার জন্য ইহা আমাদের নিকট আহ্বান জানাইতেছে।

আজিকার এই মত-সংঘর্ষের দিনে গান্ধীবাদ সত্যের শক্তি ও 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনের কথাই বলিতেছে। প্রচলিত মতবাদগুলি আদর্শের আলোকে ঐতিহাসিক তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে একমাত্র গান্ধীজীই জীবনের সার বস্তুর মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। মানুষের বৃত্তি এবং মতবাদকে কয়েকটি ছাপমারা বিভাগের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়ার ফলে জীবনের উদ্দেশ্যানুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা বিনষ্ট হইয়াছে। এক্ষেত্রেও গান্ধীজী ইতিহাস ও জীবনের ধারা নিরূপণ করিতে আমাদের সক্ষম করিয়াছেন এবং উহার প্রতি ভাবগত দৃষ্টিভঙ্গীর নির্দ্দেশ দিয়াছেন। সংকটের আর একটি বিপদ্‌জনক দিক—লক্ষ্য হইতে কর্ম বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। গান্ধীজী স্পষ্টই বলিয়াছেন যে ভাবধারার মিলিত রূপ একমাত্র উদ্দেশ্যের ফল হিসাবেই কল্পনা করা যাইতে পারে। আমরা আরও লক্ষ্য করিতেছি, জাতিসমূহকে বিশ্ব-সমাজে গ্রথিত করিবার নূতনতর

অবশ্যপালনীয় বিধি অবর্তমান। হয় গান্ধীজীর নৈতিক প্রতিভা বিশ্বজনীন, অথবা উহা নিরর্থক—এই মত পোষণ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। রাজনীতিকরা বিশ্বাস করেন, হিংসার অস্ত্র দিয়া মহত্তর রাষ্ট্র-গঠন সম্ভবপর; উঁহারা একটি বিরাট্ নীতিবান্ সমাজের কল্পনাকে উপহাস করিয়া থাকেন। ফলে আমাদের যুগের উপর অদ্ভুত এক প্রতিচ্ছায়া পড়ে। যুদ্ধের বৎসর কয়টি অতীত ইতিহাসের পাতায় স্থান লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ বুদ্ধি ও প্রীতির অন্তঃস্থিত শক্তি স্পষ্টভাবে ফুটিয়া ওঠে। গান্ধীজীর দৃঢ় বিশ্বাস—মানুষের স্বভাবকে শান্ত জীবনযাত্রার সহিত সুসমঞ্জস করা যাইতে পারে। যদি গান্ধীবাদকে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে হয় তবে উহাকে দ্রুত ঘটনা-সংঘাত অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইতে হইবে। আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রহ যতই সংকট হইতে সংকটে বিচরণ করিবে, ইতিহাসের আঘাত যতই কঠিনতর হইবে—ততই সেই বিশ্বাস বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করিবে।



বর্তমান সংকটকে প্রাগৈতিহাসিক সিদ্ধান্তের দ্বারা পর্যুদস্ত করিতে হইবে—এই মতকে অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে। মানুষের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে দু'টি বিশেষ কাল আছে। যখন ইচ্ছাশক্তি পঙ্গু হইয়া পড়ে এবং নিশ্চিহ্ন হওয়ার অনুভূতি জাগ্রত হয়। সভ্যতার রূপ এবং আদর্শ যখন মানুষের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম স্পষ্ট থাকে তখন প্রথমোক্ত বিপদটি সংঘটিত হয়। আদিকালের মানুষ প্রচণ্ড তুষার-স্রোতের গতি লক্ষ্য করে। বরফ-যুগের ইহাই মরণ-বিভীষিকা। আত্মরক্ষার জন্য সে কোন ঔষধের বিধি-ব্যবস্থা করে না। প্রচণ্ড আলোড়নকে সৃষ্টি করা যায় না—উহা সংঘটিত হয়। এই প্রাকৃতিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে আদিম বিভীষিকা উপস্থিত হয়।

সে প্রকৃতির বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সুরু করে। তাহার পরেই আসে তীব্র মানসিক যন্ত্রণা এবং অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য-বিধান। সিন্ধু, নীলনদ, ইউফ্রেটিস ও ইয়েলো নদীর তটে তটে যাইয়া মানুষ সভ্যতার হর্ম্য নির্মাণ করে। বর্ব্বর দ্বন্দ্ব, জীবনযাত্রার বিভিন্ন পরীক্ষা, কৃষি-কৌশল, অরণ্য-সংস্কার, জলাভূমি পরিষ্কার এবং কারু-কলার উন্নতি তাহার পুরাতন অভ্যাসগুলির সম-শক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রমাণিত হয়। অল্পকালের মধ্যেই এই নব অভিযাত্রীর দল ভূমি-খণ্ডের উপর অধিকার দাবী করে—ফলে একটি নূতন সামাজিক সমতার প্রতিষ্ঠা হয়। এই ভাবে আদিম যুগের মানুষ সংকটের প্রাকৃতিক কারণ উপলব্ধি করে এবং গঠনমূলক চিন্তা ও সামাজিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা বিশ্বের মূল উপাদান ও বিভিন্ন যুগের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়।

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে আমাদের অভিজ্ঞতা ও সামাজিক প্রক্রিয়া ইতিহাসের প্রাচীনতম অধিবাসীদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ-স্তরের। যখন বিপদ আমাদের গ্রাস করে আমরা সাময়িক মুক্তি ও অন্তঃসারশূন্য বহিঃপ্রকাশের অনুসন্ধান করি। নবলব্ধ সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার দিকে আমাদের চিন্তা অগ্রসর হইতে সক্ষম হয় না। রূপান্তরের এই সমস্যা আমাদের অস্তিত্বলোপকারী দ্বিতীয় প্রকার সংকটের বৈশিষ্ট্য।

স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে মানুষ প্রকৃতির নিকট হইতে শক্তি ও আনন্দ লাভ করিতে চায় না, তাহার জীবন বর্ণহীন, অর্থশূন্য হইয়া গিয়াছে। আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে ধাতব আবহাওয়া হইতে একমাত্র গান্ধীবাদের আলোকই মানুষকে রক্ষা করিতে পারে। আণবিক যুগের আপন হাতে বাঁধা গ্রন্থি মোচন ইহার দ্বারাই সম্ভব।

সজোরে বিবর্তনবাদের ঢাক পিটানোই যথেষ্ট নয়। স্থির মস্তিষ্কে আর একটি সত্য উপলব্ধি করিতে হইবে যে ইতিহাসের গঠন সম্পর্কে গভীর দৃষ্টি হইতেই জীবনের সৃষ্টিমূলক ধারণা জন্মলাভ করে।

এই বিষয়ে গান্ধীজীর অহিংসা ও বিশ্ব-দৃষ্টি সুনির্দ্দিষ্ট এবং পরিণতিশীল। মানব-জীবনের সত্যের সহিত ইহা ইতিহাসের অর্থের সামঞ্জস্য বিধান করে। অন্য কথায়, ইতিহাসের নীতির মধ্যেই মানব-প্রকৃতি প্রতিফলিত হয়। বিভিন্ন যুগের বিপ্লবী আত্মাদের মধ্যে কেহই গান্ধীজীর মত ঐতিহাসিক চেতনার পূর্ণ বিকাশের জন্য ব্যাকুল হন নাই—এই কথা বলিলে কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি হয় না।

রাজনীতিকের পরিবর্তনশীল কল্পনা ইতিহাসের মূল সূত্রটির পরিপন্থী। বাগাড়ম্বরপূর্ণ অত্যন্ত সাধারণ চিন্তাধারাকে সে রাজনৈতিক গঠনের মধ্যে গ্রথিত করিতে চেষ্টা করে। রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরাই বিশ্ববোধকে কলঙ্কিত করিয়াছে, এ কথা অকুণ্ঠভাবে বলা উচিত।

চিন্তাধারার পরিবর্তন এবং ইতিহাস-সিদ্ধ সত্যানুভূতির প্রতিষ্ঠার দ্বারাই মানবজীবনের সংস্কার সাধন করা যায়—এই যুক্তিকে খুব কম ব্যক্তিই খণ্ডন করিতে পারেন। উদ্দেশ্য ও শ্রেয়র মধ্যে নির্ভুল সমতা রক্ষা করিয়া গান্ধীজী ঐতিহাসিক কর্মস্রোতের উৎসমুখ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। পরম মূল্যের মধ্যে তিনি ইতিহাসের অর্থ অনুসন্ধান করিলেন, এবং এই প্রক্রিয়াকে সৃষ্টিধর্মী আত্মার গতিরূপে প্রত্যক্ষ করিলেন। এইভাবে তিনি ঘটনার বস্তুকে প্রগতিশীল বিশ্বাসে রূপান্তরিত করিয়া দিলেন।

সাময়িক পরিস্থিতির প্রয়োজনানুসারে মানুষ নূতন মতবাদের মুখোস পরিয়া থাকে। আমাদের যুক্তি এই যে, বিশ্বাসযুক্ত বিশ্ব-বোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত জৈব এবং ঐতিহাসিক কর্মের মিশ্রণের মধ্যে জীবনের মূল্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ইহার অর্থ, মানুষকে জীব-বিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আদর্শবাদী সংস্কৃতি রচনা করিতে হইবে। ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, প্রাকৃতিক সংকটের চাপে সাংস্কৃতিক মিলন সংঘটিত হয়। এই নব সমন্বয় জীববিজ্ঞানের দ্বারা পরীক্ষিত হইবে। সমাজের মানসিক ধ্বংসস্তূপ হইতে সেই আদর্শ সংস্কৃতি জন্মলাভ করে।

জীববিদ্যাগত কৃষ্টির এই মতবাদ ইতিহাসের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। সকল প্রকার আদর্শের গতি-নিরূপক চিত্র প্রস্তুত করিলে আমরা দেখিতে পাইব—সংকীর্ণ নির্দ্দিষ্ট মতবাদগুলিই অধিকতর অনিশ্চয়তা ও বন্ধনের সৃষ্টি করিয়াছে। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সৃষ্টিধর্মী যুগেব মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ত্তমান।

নীতিবর্জ্জিত বিজ্ঞানের কর্কশ সুর, পরিবর্ত্তনকে বরণ কারয়া লইবাব মত সাংস্কৃতিক মনোভাবের অভাব, ইতিহাসের শক্তির ছন্দ এবং গতিকে হৃদয়ঙ্গম করিবার অক্ষমতা, অনুভূতি ও আদর্শের প্রেরণাকে বিনষ্ট করা—বর্ত্তমান কালের সংকটের মূলে এইগুলি বর্ত্তমান। দর্শন, কৃষ্টি, তন্ত্র, অর্থনীতি, প্রতিষ্ঠান এবং রাজবিধিও এই সংকটের ছায়াতলে সমাগত। এই বিভীষিকা হইতে মানুষের মুক্তিলাভ করাব সম্ভাবনা বর্ত্তমানে নাই বলিলেই হয়। শাশ্বত মূল্যে মূল্যবান যে বস্তুগুলি আজ ধূলিধূসরিত এবং কর্দ্দমাক্ত হইয়া আছে তাহাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার মত অন্তরের শক্তি মানুষ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

বস্তুতঃ গান্ধীবাদ আমাদের ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। সে সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে। ইহার মতে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী সত্যের শক্তিতে উজ্জ্বল ঘটনাবলীর সাধারণ রূপের অনুসন্ধান ভিন্ন আর কিছু নহে। অর্থনৈতিক কারণের মধ্যেই ঐতিহাসিক পরিণতির বীজ নিহিত আছে—এই মার্ক্সীয় তত্ত্বকে ইহা স্বভাবতঃই অস্বীকার করে। অন্তরের অনুভূতির সহিত সম্মিলিত প্রচেষ্টার মিলন ঘটাইয়া ইহা সমগ্র চেতনাকে ইতিহাসের গতির অনুগামী করিয়া তোলে। একমাত্র এই অর্থে ঐতিহাসিক দৃষ্টি মানুষের পূর্ণ মুক্তির আশ্বাস দিতে পারে।

পরস্পরকে ভালবাসার জন্য মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রকৃত প্রীতি ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করিবে—গান্ধীজীর বিপ্লবী মন এই তত্ত্বে বিশ্বাস করিত। আলোড়নের সৃষ্টিস্থিতিকারী এই অনুভূতি

আত্মার অন্তরেই থাকে। ইহা প্রতিজনের উপর অবশ্যপালনীয় কতকগুলি কর্তব্যের ভার ন্যস্ত করে। এই কর্তব্যগুলি পালন করিলে মানুষের ন্যায্য অধিকার লাভ হয়। মানুষের জীবন একই সময়ে ব্যক্তিগত এবং ইতিহাসগত হইলে সে ঘটনা বা রীতির অত্যাচারের নিকট কখনই আত্মসমর্পন করে না—আদর্শের চরণে নিজেকে বলি দেয়। সুতরাং গান্ধীবাদী হওয়াব অর্থই ইতিহাসের মানুষ হওয়া; তাহার মধ্যে বিপরিতমুখী মতবাদের সামঞ্জস্য ঘটিয়া থাকে।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, ইতিহাস আমাদের গভীরতম সত্তার পরম অভিব্যক্তি। প্রথমে মানুষ আত্মার ক্ষেত্রে সৃষ্টিধর্মের শক্তিকে উৎপন্ন করিবে, তারপর উহা ইতিহাসের চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হইবে। ব্যক্তিগত জীবনকে বিশ্ব-ছন্দে গাঁথিতে হইলে এই স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি মানুষকে সাহায্য করিবে।

৪

জৈব এবং ঐতিহাসিক কল্পনার মধ্যে মানুষ তাহার সকল মনোবৃত্তিকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। তাহার পক্ষে চিত্তকে বিশ্বমুখীন করিয়া তোলা প্রয়োজন। ইহার অর্থ এই নয় যে, জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকর্ষণগুলিকে উপেক্ষা করিতে হইবে। যে আদর্শ জীবনকে পরিপুষ্ট করে, সংকীর্ণ দার্শনিক মতবাদগুলি ইতিমধ্যেই তাহার প্রাত আঘাত হানিয়াছে। অনুদার মত এক আঘাতেই জীবনের মূল্যগুলিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। শ্রেণী-সংঘর্ষের চরম নীতিবিহীনতা এবং পেশাদারী বিপ্লববাদ—এইগুলিই আজ প্রচলিত চিন্তাধারার অঙ্গীভূত। এই ধরণের মত অনুযায়ী কেবলমাত্র হিংসানীতি-শিক্ষাই জনগণকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করিতে পারে। রাজনৈতিক এবং মনোবৃত্তিমূলক দ্বন্দ্বই সেই বিপ্লবকে পরিপুষ্ট করে।

যে বস্তুতান্ত্রিক চিন্তার ফলে আমাদের অনুভূতি বিষাক্ত এবং জীবন-ছন্দ বিকৃত হইয়াছে তাহাকে উপেক্ষা করা চলে না। নিয়ত-প্রচারিত মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ সম্পর্কে আমাদের একটু সাবধান হওয়া প্রয়োজন। রঙ্গমঞ্চের আড়ম্বরপূর্ণ এই কথাটি কমিউনিষ্টদের বুলি হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা কমিউনিজমের নীতি, ইহার বিশ্ব-ছন্দের ঐশ্বর্য, ইহার জাগরণী আহ্বান সম্পর্কে বিশেষরূপে সচেতন, তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস—মার্ক্সীয় বিশ্ববাদ ঝঞ্ঝার মুখে তৃণখণ্ডের সমান।

অথচ আমরা ধনিকশ্রেণী পরিচালিত গণতন্ত্রের অন্তঃসারশূন্য অনুমান ও বিচিত্র রুচিকেও সাগ্রহ আহ্বান জানাইতে পারি না। উহাদের কৌশল বিশ্বের বিরাট স্বপ্নকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। ধনিক-অধ্যুষিত গণতান্ত্রিক জগৎ শুধু ধনী হইতেই চায়; প্রতিদ্বন্দ্বীকে রাজ-নৈতিক অর্থে গ্রাস করিবার মানসে উহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির সাহায্য ও অনুমোদন বিশেষভাবে কামনা করে। উহারা মুক্তি ও সংস্কার কল্পে যে কার্যসূচী গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে পৃথিবীর বিরাট অংশে নূতনতর অর্থনৈতিক দাসত্ব সৃষ্ট হইয়াছে। এই বিপজ্জনক অবস্থাই যে য়ুরোপের চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার মূল কারণ, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। য়ুরোপের সংস্কৃতি গ্রীসীয়, রোমক এবং খ্রীষ্টীয় দৃষ্টি-ভঙ্গীর সমন্বয়। কিন্তু যুদ্ধোত্তর য়ুরোপের অন্তরে কমিউনিজমের বিষ প্রবিষ্ট হইয়াছে।

বৈদেশিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের ধারণার মধ্যে আজ আদর্শ এবং পরিপ্রেক্ষিতের অনিশ্চিত মিশ্রণ দেখা যায়। যে নীরব অথচ সুনির্দ্দিষ্ট ভাবধারা আমাদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, গান্ধীজীর সেই বিশ্ব দৃষ্টিকে উহা অস্বীকার করিয়াছে। পৃথিবীর রোগ-নিরা-ময়ার্থে 'সম্মিলিত বিশ্বরাষ্ট্রপুঞ্জে'র মত যান্ত্রিক সর্বকল্যাণকর বস্তু—গান্ধীবাদের নিকট পরিত্যজ্য। রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীবাদের মূলতঃ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে অনেকেই উপহাস করিয়া থাকে। মানবেতিহাসের এই নূতন অবদান শীঘ্রই এক মহত্তর জাতীয় আন্দোলন সৃষ্টি করিবে; এই আন্দোলন হইবে শক্তির বিরুদ্ধে অহিংস সংগ্রাম। নবজাত

গণতন্ত্রের কর্তব্য 'বিপ্লবী জনকে'র মূল শিক্ষাকে অনুসরণ করা। যে স্বপ্নবিলাসী ব্যক্তিরা আমাদের দেশকে বিপদের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইতেছে তাহাদের কর্ম্মের তীব্র প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। যুদ্ধ-বিগ্রহ কেমন করিয়া পৃথিবীকে একটি বিরাট্ হত্যাগারে পরিণত করে তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। গান্ধীবাদ-প্রসূত একমাত্র আন্তর্জ্জাতিক আশার মৃত্যু-গাথা রচনা করা কোনো নৈতিক দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন এবং আত্মসচেতন সুস্থ শাসনতন্ত্রের পক্ষে উচিত নহে।

সমগ্র জাতি গান্ধীবাদকে যে কোনো মূল্যে গ্রহণ করিবার আগ্রহ দেখাইয়াছে। ইহার তত্ত্ব এবং রীতি লক্ষ লক্ষ মানুষকে সৃষ্টির প্রেরণা দিয়াছে। এই আদর্শ যে ইতিহাসকে রূপান্তরিত করিয়াছে, সারা জগতে এ কথা স্বীকার করিবার লোকের অভাব নাই। কিন্তু আমরা বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিয়া থাকি—মহাত্মার একনিষ্ঠ শিষ্যরা সরল এবং বাস্তবভাবে এই আদর্শের ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক। জনসাধারণের মধ্যে কল্পনার শক্তি এবং বিপ্লবে বিশ্বাস এখনও বতমান। তাহারা জানে, গান্ধীনীতির একটি স্তর অপর স্তরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট—পরিবর্ত্তনশীল ঐতিহাসিক পটভূমি উহাকে টলাইতে পারে না।

প্রাচ্যেও কমিউনিজমের বিভীষিকা জীবনের পরমমূল্য ও ছন্দকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে। যে চীন সংস্কৃতির ঐতিহ্যে গরীয়ান্, যে মহাদেশ মানুষকে নম্র এবং মধুর নীতিজ্ঞান দান করিয়াছে, কন্‌ফুসিয়াস্ ও লাওৎসের নাম দ্বারা যে ইতিহাসের ধারাকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে—আজ সেই চীনকে তাহার পূর্ব্বতন সত্তার ব্যঙ্গচিত্র বলিয়া মনে হয়। এই প্রাচীন দেশের ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে মার্ক্সীয় মতবাদের মধ্যে প্রাণশক্তি এবং সম্পদ্ আছে, এবং ইহা বিশ্বাসবিহীন বর্ত্তমান যুগের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। আজ চৈনিক সংস্কৃতির রাজপথ মতবাদের অস্থিচূর্ণে গঠিত ; হয়ত নূতন আর একটি মতবাদ উহাদের সহিত যুক্ত হইয়া যাইবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস,

এশিয়ার মধ্যে গান্ধীজীর ভারতবর্ষ কিছুতেই কমিউনিজমের অনুকরণ করিবে না।

ভারতের স্বকীয় একনিষ্ঠতা আছে। নৈতিক আশার প্রতীক গান্ধীবাদে সে বিশ্বাস করে। সে তাহার আদর্শকে শৈবালদামে আচ্ছন্ন হইতে দেয় নাই। সেই আদর্শের শিখা আকাশপ্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল—উহা আমাদের মধ্যে নবজাত চেতনার সঞ্চার করে।

নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ কখনই খদ্দরের গান্ধীটুপির পরিবর্তে শ্রমিকের পায়জামা গ্রহণ করিতে পারে না। দুর্দ্ধর্ষ মহাসাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সে সংগ্রাম করিয়াছে। তাহার নবতম পরিণতির মূল কথা—প্রকৃতির সহিত নৈকট্য, ইতিহাসগত চেতনা এবং উদার সমন্বয়। নৈতিক অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রচেষ্টাই ইহার সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ভিত্তি। এ কথা ভুলিলে চলিবে না—ভারতবর্ষ অত্যধিক স্বার্থপর এবং শোষণবিলাসী রাজ্যগুলির সহিত অস্বাভাবিক অংশীদারী বেশিদিন চালাইতে অক্ষম। বিশ্বমানবতাকে সৃষ্টি করিয়া সে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নূতন বিজ্ঞান রচনা করিবে।



এই পূর্ণদৃষ্টি মানব সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ব এবং বিশ্বপ্রকৃতির অরুণালোকে দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া দিবে। জীবনের যে মূল্য, সৌন্দর্য ও সমতা দীর্ঘকাল ধরিয়া অবলুপ্ত হইয়া আছে তাহাকে সে পুনরায় আবিষ্কার করিবে। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত যুগে মানুষের পলায়নবৃত্তি অত্যন্ত সজাগ। মোহভঙ্গের ফলে সে ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠে—সাংঘাতিক মিথ্যাকে স্বীকার করিতেও দ্বিধা বোধ করে না। দলীয় স্বার্থে অন্ধ হইয়া সে অত্যুজ্জ্বল সত্যকে দেখিতে অক্ষম হয়। নীরস আবহাওয়া হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মানুষ অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব, ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য, নকল আভিজাত্য এবং অপরাধমূলক উপন্যাসকে আশ্রয় করে। বস্তুতান্ত্রিক নিয়মের বাহিরেও তাহার অর্থলিপ্সা বিস্তৃত

হয়। আহার-বিহারের সংকোচ ও কালোবাজার, মানসিক সংযম ও ব্যয়ের প্রয়োজন মানুষের মনকে সর্ব্বদা উত্তেজিত এবং চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে। তবু দেখিতে পাই, অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি, মূল্যবোধ এবং হৃদয়াবেগের প্রবল প্রেরণা মানুষকে অগ্রগতির পথে যাত্রা করিতে সাহায্য করিয়াছে। জীবনকে জনগণরূপ দান, কেন্দ্রীয় শহর-প্রতিষ্ঠা, যান্ত্রিক রাজনীতি এবং মতবাদের অভিযান ব্যতীত সৃষ্টিধর্মের তাপমান যন্ত্রে আর কোন বৃদ্ধি লক্ষিত হয় না। নূতন মানসিক আবহাওয়ার আগমন-ধ্বনিও আমরা শুনিতে পাই না। বৈষয়িক ব্যক্তিরা নূতন বিধানের অভাষ সৃষ্টি করিতে পর্যন্ত অক্ষম হইয়াছেন।

জীবনের কল্পনাপ্রধান প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত অন্তরের পরিচয় বর্তমান। বর্তমান সাহিত্যের অতি সংক্ষিপ্ত তারবার্তাকল্প বাক্যগুলি পাঠকের বিরক্তি এবং কৌতূহল উৎপাদন করে। সমাজ-তত্ত্ব-বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অনুভূতির রেখাচিত্র প্রস্তুত করেন—উহাদের প্রত্যেকটি যাদুঘরে রক্ষিত হইবার যোগ্য। চিত্তের এই দ্বন্দ্ব দ্বি-মুখী জীবন যাপনের আকাঙ্খাকে জাগ্রত করে। এইপ্রকার অস্তিত্বের মধ্যেই ধ্বংসের বীজ নিহিত আছে। দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে অস্বাভাবিকতা বর্তমান ; নূতন যুগের চিকিৎসকরা মানুষকে নিজের স্বার্থের প্রতি অচঞ্চল দৃষ্টি রাখিতে বলিতেছেন। আধুনিক কালের ইতিহাস ও জীবনীর মধ্যে খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের উপাদান—শত শতাব্দীর বিরাট সেতুর পটভূমিকায় রচিত বর্ণোজ্জ্বল চিত্র নাই। আজিকার শিল্প মৃত বাক্যের পিরামিড মাত্র—উহা শুধু অকিঞ্চিৎকর রস-পিপাসাকে নিবারণ করে।

অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্যও মানুষের চিন্তা করা উচিত—কেন তাহার জীবন প্রেরণাশূন্য হইয়া গিয়াছে। সত্য হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার কারণগুলি বিশাল এবং বিচিত্র। বিশ্বমানবের পরিকল্পনা মানবীয় দৃশ্যপটের প্রতি আমাদের আকৃষ্ট করিবে। উদারতম অর্থে বিশ্বমানব প্রকৃতির সম্পদে ঐশ্বর্যবান, তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, সহজ

আভিজাত্যে পূর্ণ, গভীরতর জ্ঞানে সমৃদ্ধ; সে বিভিন্ন যুগের মূল্যবান ফসল আহরণ করিয়া থাকে। বিশ্বজনীন উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে যাত্রা করে বলিয়া এই মানুষ পারিপার্শ্বিকের প্রতি অসন্তোষ ও উত্তেজনার গোপন আকাঙ্খাকে জয় করিতে পারে। ইহার দ্বারা চিন্তা এবং আত্মিক সমৃদ্ধির নূতন পথ আবিষ্কৃত হয়। রাষ্ট্রবাদ, অনুদার শাসনতন্ত্র, হিংসা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র এবং যান্ত্রিকতার মোহে বিনষ্টপ্রায় মানবপ্রীতি পুনরায় জীবনের মূলসূত্র হইয়া উঠিবে। এই পথে প্রতি চরণক্ষেপের অর্থ বর্ব্বরতার বিপজ্জনক সীমান্ত হইতে ক্রম-অপসরণ।

প্রকৃত দার্শনিক ভিত্তি হইতেই নয়নবিমোহন জীবন-দৃষ্টি উৎসারিত হয়। তখন সেই নূতন সমন্বয়—'বিশ্বমানব' নিজ সত্তার মধ্যেই সর্ব্বভূতের প্রতি বিশ্বাসকে বহন করে। ইহা সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন মনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সৃষ্টি—এবং বর্ত্তমান কালের পক্ষে বিশেষ ভাবে উপযোগী। আমাদের এই প্রচণ্ড পরিবর্ত্তনের যুগে স্বল্প পরিসরের মধ্যেই সকল কল্পনা প্রতিভাত হয়। নিজেদের মতবাদকে সর্বজনের অবশ্য গ্রহনীয় করিবার আকাঙ্খায় মানুষের নৈতিক মূল্য বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। আত্মিক শক্তিতে অবিশ্বাস এবং নির্জ্জনতা ও অন্তর্মুখীনতা সম্পর্কে ভীতি এই দৃষ্টিভঙ্গীরই ফল। ব্যক্তিসর্ব্বস্ববাদের কালো ছায়া যে ঘনাইয়া আসিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি!

একটি ধারণাকে বিভিন্ন স্তরে বিস্তৃত করিয়া দিবার সময় প্রতিটি বাধা লঙ্ঘন করিবার এবং নব নব শিখরে আরোহণ করিবার লোভ সংবরণ করা কঠিন। বিশেষ করিয়া বিশ্বমানবত্বের বহু বিচিত্র দিক আছে; মানুষের সরলতম অনুভূতিকে ইহা মনোমুগ্ধকর বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। ইহা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের নিরসন করে, এবং এই ঘটনাকে মানবীয় নাট্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়। বিশ্বমানব-পারকল্পনার পট বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন; তুলির প্রতিটি আঁচড় সমগ্র সত্যের রূপকে বিকশিত করিয়া তুলিবে।

পরিশেষে মনে হয় ইহাকে 'মানব' বলাও কঠিন, আবার 'বিশ্বজনীন' বলা কঠিনতর।

যে কালে বিজ্ঞান এবং বিদ্যাবত্তার উপর সমগ্র দৃষ্টির প্রভাব শিথিল হইয়া যায় সে সময় নানা মতবাদের অনাসৃষ্টি জীবনকে গ্রাস করিয়া ফেলে। বিশ্বজনীন দৃষ্টিতে ব্যক্তিত্ববাদের বিচার করাই এই অনাসৃষ্টি সমস্যা সমাধানের সঠিক পথ। হিংসা, জাতিগত গর্ব্ব ও রাষ্ট্রপূজার ঘূর্ণীর মধ্যে পড়িয়া মানুষের অন্তর্নিহিত সত্য ও মূল্য যে বিকৃত হইয়াছে, অনেকেই এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। অবশ্য এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ যে গল্পগুজবের সময় অনেকেই সৃষ্টিধর্মী ব্যক্তিত্বের কথা বলিয়া থাকেন। বিরক্তির সময় উত্তেজিত হওয়া বা চাটুবাক্যে আনন্দিত বোধকরা—ব্যক্তিত্বের অর্থ যে এই ক্ষমতার চেয়ে অনেক কিছু বেশী সে কথা আমাদের জানা কর্তব্য। বস্তুতান্ত্রিক এবং নৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে নিজেকে সরল ভাবে ফুটাইয়া তোলাই ব্যক্তিত্ব। ইহা জীবনের কাব্য এবং আদর্শ, চিরন্তন সত্য-সমন্বিত শক্তি। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী কালে ইহা রাহুগ্রস্ত হইয়াছে; স্বার্থান্বেষী দার্শনিক মতবাদগুলি ইহার প্রতি ঘৃণা পোষণ করিতেছে। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে জীবন-দর্শন রূপে এই সৃষ্টিধর্মী আদর্শকে গ্রহণের স্থান আণবিক যুগের চিন্তাধারার বহু ঊর্দ্ধে।

৬

আমাদের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে মানবাত্মা আজ ভারাক্রান্ত এবং বিকৃত। যে বেদনাবোধ এবং শক্তি সকল বস্তুকে সামগ্রিক সমন্বয়ের মধ্যে লইয়া আসে, তাহাকে যান্ত্রিকতা এবং নিপীড়নের অভ্যাস বিনষ্ট করিয়াছে। কিন্তু মানুষের অন্তরে এমন গভীরতর স্থান আছে যাহাকে কোনো মতবাদ বা প্রক্রিয়া স্পর্শ করিতে পারে না। যতক্ষণ সত্যের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা থাকে ততক্ষণ তাহার রক্ষাকবচ

অটুট থাকে। ইহাই জীবনের গূঢ় অর্থের, বস্তুর সার তত্ত্বের উপলব্ধি। মতবাদের ভাববিলাস এবং জাতিগত দম্ভের আন্তর্জ্জাতিক অবতারদের সহিত জগতের যথেষ্ট পরিচয় ঘটিয়াছে। মানুষের আত্মা একতিলও শান্তি খুঁজিয়া পায় নাই। ডিক্টেটররা গর্জ্জন করিয়া বলেন— মিথ্যাভাষণের যন্ত্র যে অনুভূতির সৃষ্টি করে তাহাই বিবর্তনের আগামী স্তর।

আধুনিক সংকীর্ণ মতবাদ ইতিহাসের তিনটি শিক্ষা অনুধাবন করিতে অসমর্থ হইয়াছে। প্রথম—সংস্কৃতিই বিশ্ব-অনুভূতির অগ্রগতি নির্দ্দেশ করে। দ্বিতীয়তঃ, যখন মানুষ পরম মূল্যকে দেখিতে পায় তখন সে বিশ্ব-সংকটকে নিয়ন্ত্রিত এবং দূরীভূত করিতে পারে। পরিশেষে, মানুষের নূতন পরিকল্পনা রচনা করিবার শক্তি অনাদি ও অনন্ত। অতএব কর্ম এবং আদর্শের বিচার একটি মাপকাঠির দ্বারা করা উচিত—ইহা মানবকে ক্রমবিবর্তনধারার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রূপে স্বীকার করে কি না। সুতরাং সকল বিশ্ব-পরিকল্পনা বা বিশ্ব-নীতির মধ্যে নব সমন্বয়ের একটি ধারণা বর্ত্তমান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইহা মানুষকে সর্বজনীন দৃষ্টি দান করিবে। চিরন্তন সত্য পরিবর্তনশীল ব্যক্তিগত রূপের দ্বারা আবৃত থাকে। যখন পরম ক্ষণ উপস্থিত হয় তখন অজ্ঞেয়বাদ বিশ্বাসে রূপান্তরিত হইয়া যায়, অন্ধ অনুসন্ধানের পরিবর্তে চরম সত্য আবির্ভূত হয়। সৃষ্টির প্রেরণাই মানব-চিত্তের দৈবভাব—উহা জীবনধারার মধ্য হইতেই উদ্ভূত হইয়া বন্ধন ও প্রলোভনকে জয় করিয়া থাকে।

সান্ত্বনার কথা এই যে, বিশ্ববোধের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে এবং ইহা নব-গান্ধীবাদের শিখা স্পর্শ করিয়াছে। যতদিন এই পূর্ণ-মানবতত্ত্ব ব্যক্তি ও সামাজিক মূল্যের বন্ধনকে সুদৃঢ় রাখিবে ততদিন এই সত্য আমাদের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিবে। মানুষের অনুভূতিকে ব্যক্ত করে বলিয়া ইহার প্রভাব সর্ব্বদাই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। ইহা সৃষ্টিধর্মী ব্যক্তিত্বকে বিবর্তনের লক্ষ্য এবং কেন্দ্র বলিয়া স্বীকার

করে। এই আদর্শের দৃষ্টিতে মানুষ এমন একটি ব্যক্তি, যে অগ্নিগর্ভ উৎসাহ লইয়া সত্য ও প্রেমের ঊর্ধ্বগামী বায়ুস্রোতে ভাসিবার জন্য ব্যাকুল। ইহা চক্ষের সম্মুখে চাঞ্চল্য, আনন্দ এবং পরীক্ষার একটি রাজ্য সমুদ্ভাসিত করিয়া দেয়।

বর্তমানে অকৃত্রিম, সমন্বয়ধর্মী এবং আদর্শবাদী বিশুদ্ধ দর্শন-শাস্ত্রের প্রয়োজন। সৎ, সারবান ব্যক্তিই গান্ধীবাদী—এবং মানব-চিত্তের অনুগামী হওয়াই সারবত্তার পরিচয়। প্রকৃতি, ঐতিহাসিক পটভূমি এবং আপন সত্তার সহিত মানুষের চিরন্তন সংগ্রাম। ইহার ফলে তাহার জীবনে নূতন ধরণের চিত্তচাঞ্চল্য, অনিশ্চয়তা এবং সন্দেহের উদ্ভব হইয়াছে। জীবনের দ্বন্দ্ব ও বেদনাকে রজনীর শান্তিময়ী আহ্বানধ্বনিতে রূপান্তরিত করিয়া গান্ধীবাদ বিশেষ একটি পথের সন্ধান দিয়াছে। মানুষের প্রকৃতি এবং নিয়তি একটি ত্রিকোণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—বিশ্ব-দৃষ্টি, সত্যের শক্তি ও অহিংসা। আত্মার রূপান্তরই জগতের পুনরুজ্জীবনের কারণ, ইহাই হইল ঐ শক্তির মূলতত্ত্ব। ইহার জন্য প্রচণ্ড আত্মিক সংগ্রামের প্রয়োজন হয়। যাহারা এই সংগ্রামে লিপ্ত, বোধি অথবা আত্মবলিদান শাস্তিরূপে তাহাদের নিকট উপস্থিত হয় না—উহা সত্যাগ্রহীদের ভাগ্যলিপি। সেই বিয়োগান্ত সৌন্দর্য যাহাদের মনকে চঞ্চল করিয়া তোলে না, তাহারা সত্যের পূর্ণতম রূপ দেখিতে অক্ষম। এই প্রকার বীরের আত্মবিসর্জ্জন দ্বারাই বিশ্বমানব জগতের একমাত্র অনুভূতিকে অভ্যর্থনা জানাইতে পারে।

কোন্ হৃদয়াবেগ এবং স্বরবৈশিষ্ট্য গান্ধীবাদসম্মত তাহা জগৎ আজ বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে। যাহারা অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে, যখন সেই জাতিরই একজনকে ভারতবর্ষ গবর্ণর-জেনারেল পদে নিযুক্ত করিল তখন গান্ধীবাদের সামঞ্জস্যের ধারা বিশ্বপ্রাণকে যেন আপ্লুত করিয়া দিল। এই মহান্ ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে সত্যাগ্রহের স্পর্শ ও শক্তি এবং ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন প্রতিফলিত

হইয়াছে। যে জাতি জলদস্যুদের প্রশংসা করে, বারুদ বোমার সাহয্যে রেড ইণ্ডিয়ানদের এবং সেঁকো বিষদ্বারা অষ্ট্রেলিয় অধিবাসীদের উৎখাত করিয়া দেয়, যাহারা অসাধুতাকেই 'জনবুলে'র ধর্ম বলিয়া প্রচার করে—এ হেন জাতিকেও ভারতবর্ষ বিশ্বাস করিল। রাভি নদীর পশ্চিমপারের অধিবাসীরা এই ঘটনাকে মৃত্যুবরণ বলিয়া অভিহিত করে।

লিখিত ইতিহাসের সকল কাহিনীর মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। জগৎ ইহাকে ভারতবর্ষের আত্মিক ইতিহাসের অন্যতম অনাবিষ্কৃত উন্নত চূড়া বলিয়া স্বীকার করে। ভারতীয় চিন্তাধারার শৌর্য, গভীর আত্মবিশ্বাস এবং বিশ্ব-দৃষ্টির ইহাই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, মুক্তি-লাভের কৌশল ও প্রকৃত শান্তি আণবিক বোমা, 'স্পিট্‌ফায়ার' এবং 'রাডারে'র উপর নির্ভর করে না—উহার মূলে থাকে আদর্শবাদীর স্বপ্ন।

গান্ধীবাদ কোনো উন্নাসিক তত্ত্বকথা নয়। ইহা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-দর্শন। কালেব চক্রে ইহার স্পষ্ট দার্শনিক চিন্তাধারা বিশ্ব-ইতিহাসের মূল শক্তি হইয়া উঠিয়াছে। দশ বৎসরের মধ্যেই গান্ধীবাদের প্রতীকগুলি মুক্ত এবং সমন্বিত জগতের বিজয়-তোরণের উপর শোভা পাইবে।



—বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আবেদন—

আমাদের যুগে বুদ্ধির প্রাধান্য এবং সংগ্রামশীল আদর্শবাদ রাহুগ্রস্থ হইয়াছে। দাসত্বের মোহ আমাদের চিন্তা ও সংস্থাকে গতিহীন করিয়া দিয়াছে, বিচিত্র মতবাদ ও দাসসুলভ মনোবৃত্তি বুদ্ধিগত জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্য বিষময় উত্তবাধিকার রাখিয়া গেল, শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করিতে ভয় পান। তাঁহাদের বিচারবুদ্ধি ন্যায্য অনুভূতিসম্পন্ন না হওয়ায় তাঁহারা জীবন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে গতিশীল সমতা সৃষ্টি করিতে অকৃতকার্য হইয়াছেন। দাসত্ব ও অধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহারা ঐতিহাসিক আদর্শের উপর কালোছায়া বিস্তার করিয়াছেন। আত্ম-প্রবঞ্চনাকে বাস্তববোধ এবং রাজৈশ্বর্যকে মন্দির-প্রদীপের দীপ্তি বলিয়া তাঁহারা ভুল করিয়া থাকেন। সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ যখন বিকৃত তখন আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে নব নব প্রাণশক্তি কেমন করিয়া থাকিবে? মস্তিষ্কজীবী মানুষ আজ চাটুকারিতা করিতেছে এবং কুসংস্কারকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

সমসাময়িক কাব্যে বলিষ্ঠ কল্পনা নাই, দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে নৈতিক বোধের অভাব, ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রাণময় আদর্শ অনুপস্থিত এবং সমাজবিজ্ঞানগুলি পরস্পরের সহিত যোগাযোগশূন্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যখন দাস-স্রষ্টাদের নিকট হইতে কৌশল আয়ত্ত করে তখনই মুক্তি-স্বপ্ন বিলীন হয়। আত্মার মৃত্যু ঘটে। পরী-রাজ্যের প্রতি আকর্ষণ, পতঙ্গের শোভা আর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মৃদু সূর্যালোক—এই সকল কল্পনা বুদ্ধিগত কোনো সমস্যারই উদ্রেক করে না। সত্য-পরিবর্তনশীল স্তরে থাকার জন্য কমনীয় শিল্প-কলাগুলি বলিষ্ঠ ভঙ্গীসম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে না। উহার দুর্ব্বল

ছন্দ আমাদের বিস্মৃতির রাজ্যে লইয়া যায় এবং দাসত্বকে চিরস্থায়ী করিয়া তোলে।

অন্তরের এই অন্ধকারের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, রাধাকৃষ্ণন্, শ্রীঅরবিন্দ ও সরোজিনী দেবীকে উজ্জ্বল দীপশিখার মত মনে হয়। সংগীত ও উপদেশ, প্রতীক ও আঙ্গিকের দ্বারা তাঁহারা কৃষ্ণ রজনীকে দীপান্বিত করিয়া দেন। উন্মাসিক বৃত্তি, বিভীষিকা-উৎপাদনকারী যন্ত্র ও অকল্যাণের প্রলোভনকে সমগ্র জাতি উপহাস করিতে শেখে। তাহারা হীন অত্যাচারকে পরাভূত করিবার স্পর্শমণির অনুসন্ধান করে। গান্ধীজীর নৈতিক স্থৈর্য আমাদের গভীরতর আকাঙ্ক্ষা এবং মহৎ নিয়তির চরম গতিপথ। যে শক্তিশালী মন রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকৃষ্ণনের মত ব্যক্তিদের প্রভাবিত করিতে পারিয়াছে তাহা সৃজনধর্মী উত্তাল তরঙ্গের আবির্ভাবও ঘটাইতে পারিবে। সত্যকে লাভ করিবার জন্যই জগতের অস্তিত্ব—এই ঘোষণার দ্বারা গান্ধীজী স্বীয় যুগের মানুষদের হতবাক্ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার বীর্য, চরিত্রের নম্রতা, সদাজাগ্রত নৈতিক বোধ, বিচিত্র যুক্তিপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উক্তি, সূক্ষ্ম মতামত, এবং একমেবাদ্বিতীয়মের অনুসরণ—ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও বোধের পরম প্রকাশ রূপে চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। গান্ধীজী তাঁহার আদর্শের রহস্য লুকাইয়া রাখিতেন না, অতি সুন্দর সংক্ষিপ্ত বাক্যের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি 'সত্যাগ্রহ' এই পরম মূল্যবান কথাটি এবং আত্মশুদ্ধির দায়িত্ব প্রবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার নীতি একটি যোগারূঢ় মানসিক অবস্থা আনিয়া দিল এবং সমগ্র জাতি পরিপূর্ণতার পথে যাত্রা সুরু করিল।

গান্ধীজীর নীতিই তাঁহাকে মহাত্মা এবং শহীদের পদে উন্নীত করিয়াছে। ইহার দ্বারা বেদনার পটভূমি রচিত হইয়াছে এবং তিনি বিচ্যুতির দীর্ঘস্থায়ী পীড়াকে অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি প্রেমের গভীর গুহামধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

গান্ধীজী শঙ্করাচার্য বা হেগেলের মত কূট দর্শনতাত্ত্বিক ছিলেন না; নূতন ভাষায় তিনি আমাদের নব জীবন-দর্শন দান করিলেন। অন্তর্গূঢ় অনুভূতির দৃষ্টিভঙ্গী এবং উহার কল্পনার প্রয়োগ—গান্ধীজী এই দুটি বস্তুর সূচনা করিয়া গিয়াছেন। মানুষের মুক্তির প্রশ্নকে তিনি চারণের শোকগাথা এবং কতকগুলি বাঁধা-ধরা বুলির ঊর্ধ্বে তুলিয়াছেন। তিনি বিশ্বমানবের কল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; আত্মা তাহার পরিবেশ রচনা করিতে সমর্থ হইল।

জনসাধারণকে নৈতিক সংগ্রামের পুরোভাগে থাকিতে হয়—ইহাই গান্ধীজীর চিন্তাধারার পরম বৈশিষ্ট্য। এই ভাবে ইহা ইতিহাসের নূতন রাজ্য, রৌদ্রোজ্জ্বল অন্তহীন প্রান্তরকে উদ্‌ভাসিত করিয়া দেয়। এক অদৃশ্য শক্তি গান্ধীজীকে চাষীদের প্রতি আকৃষ্ট করিল। তিনি চাষীর মধ্যে অসীম ধর্মভাব, আশা ও শক্তিকে আবিষ্কার করিলেন। কৃষক-আন্দোলন ব্যতীত কোনো মতবাদই যে আমাদের দুঃখের বিন্দুমাত্র হ্রাস করিতে পারে না—ইহা তিনি জানিতেন। এই পরম প্রচারকের কোনো বিশেষ প্রকার পরিচ্ছদ নাই, অথচ জনতা তাঁহার স্বর্গীয় বাণী শ্রবণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। তাঁহার বিরাট্ আদর্শ উহাদের সকল প্রকার সমস্যারই সমাধান করিয়া দেয়।

মহাত্মা পুরাতন আলোকের পরিবর্তে নূতন নীতির প্রদীপ অকুণ্ঠভাবে দান করিয়া গেলেন। আমরা প্রতিদিন উহার যত্ন লইব এবং সেই দীপ্তির মধ্যে নব নব দৃষ্টিভঙ্গী আবিষ্কার করিব। চিন্তা-সমন্বিত হৃদয়াবেগ, সংক্ষিপ্ত উক্তি, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রীতি এবং মহান্ আত্মার জ্যোতি মিলিয়া নূতন নীতি এক অপূর্ব্ব সাহিত্যের ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে। কঠোর নীতির ভাব থাকা সত্ত্বেও ইহা নীরস নয়—মনোমুগ্ধকর। ইহা মানুষকে বিফল, অন্ধকারময় অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া আপন স্বর্গ রচনা করিবার উপদেশ দেয়। ইহা অবিলম্বে সত্য পথ গ্রহণ করিবার বুদ্ধিকে জাগ্রত করে।

গান্ধীজীর চিন্তাধাবার চবম যুক্তি যান্ত্রিক সভ্যতাকে দেউলিয়া ও অমানুষিক বলিয়া অভিহিত করে। যখন প্রতি নূতন সত্য মানবীয় পবিবেশ রচনা কবিতে থাকে তখন সংস্কৃতি পুনরুত্থানের ধাবা রূপে প্রতিভাত হয়। জগৎ ও জীবনেব যে তত্ত্ব ব্যক্তিকে কল্যাণেব কল্পমূর্তি নির্মাণের অধিকাব হইতে বঞ্চিত করে তাহা অসম্পূর্ণ। এই নূতন সত্য যখন সৃষ্ট জীবেব সর্ব্বাঙ্গীন ও কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ কবে তখন উহার নৈতিক মূল্য স্বীকৃত হয়। তখনই মানুষ সত্যেব বেদনা অনুভব করে এবং ইহা আত্মিক শক্তি ও বাস্তবতাব মধ্যে ব্রূপায়িত হইয়া উঠে।

গান্ধীজীব এই আদর্শ আবামেব নয—সংগ্রামেব। ইহা অশান্ত অবস্থাকে সৃজন ও পালন কবে; আত্মাব নবজন্ম লাভেব মধ্য দিয়া মানুষকে ধ্বংস হইতে বক্ষা কবে। ঈশ্ববকে সত্য-ব্রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া গান্ধীবাদ মানবাত্মা ও উহাব চিরন্তন অনুসন্ধানকে অদর্শগত মূল্যে মূল্যবান কবিযা তুলিয়াছে। মানুষের রাজ্য মূল্য, স্বাধীনতা, আত্মা, গতি ও সংগ্রামেব বাজ্য—এই সত্য স্বীকাবেব দ্বাবা ইহা নিব্রূপণ-বাদকে প্রচণ্ড আঘাত কবিয়াছে। মানুষ শৃঙ্খলকে সঙ্গে লইয়া জন্ম-গ্রহণ কবে নাই বটে কিন্তু তাহাব জন্ম হইয়াছে উচ্চববে পরিপূর্ণ জগতে, বেতাবযন্ত্র-কণ্টকিত পৃথিবীতে। সে ইচ্ছা করিলে মতবাদের মুখোস পরিয়া মানুষেব সভ্যতাকে বিকৃত করিতে কিংবা মূলগত ঐক্য-প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হইতে পারে। গান্ধীজী প্রচণ্ড জোরের সহিত বলেন যে, মানুষ ক্ষুদ্রতম সংস্কৃতি-ক্ষেত্র। সুতরাং তাহার পক্ষে একটি প্রভাবসম্পন্ন কৃষ্টির উৎসকে প্রাণবন্ত অথবা বিষাক্ত করিয়া দেওয়া সম্ভবপর। জ্ঞান, প্রচেষ্টা ও সজীব সম্পর্ক সংস্কৃতিকে উহার প্রধান অক্ষ—সত্যের শক্তির উপর ঘুরাইতে থাকে। ইহার গঠন—অনুভূতি, যুক্তি ও পবীক্ষার সত্যকে আত্মস্থ করিয়া লয়।

সামাজিক নীতিকে রক্ষা করা যে কত কঠিন গান্ধীজী তাহা জানিতেন। অহিংসা—এই শব্দটির মধ্যে তিনি মানুষের ঐতিহ্য ও জীবনীশক্তির আনন্দ এবং নিশ্চয়তা আবিষ্কার করিয়াছেন। বিশ্বাস-

ঘাতকতা ও রক্তক্ষরণের দোলায় দোদুল্যমান জগৎ তাহার নৈতিক আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য প্রলুব্ধ হয়। সেই আদর্শের মধ্যে হাজার মানুষের নিবিড় স্পর্শ, ফুল্ল কুসুমিত লতার গৌরব এবং সূর্যকিরণ ও শিশিরস্নাত প্রান্তরের মনোহর শোভা অনুভব করা যায়। ইহাই অনুভূতির অন্তর্নিহিত সত্য এবং ক্রমবিকাশের নীতি। এক রহস্যবাদী চরম রহস্যবাদীর আহ্বানে সাড়া দিতেছে, প্রকৃতির আবরণ উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইতেছে। ইহা যদি মানুষকে মুগ্ধ করিতে না পারে তবে প্রধান ধর্মমতগুলিকে অবিলম্বে নাস্তিক্যবুদ্ধির মধ্যে কবরস্থ করা প্রয়োজন।

আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে গান্ধীর জীবন-দর্শন দুঃখকে লইয়া কোনরূপ বিলাসিতা করে না। মূল্যবোধই মানুষের চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে—এই সত্যে উহার দৃঢ় বিশ্বাস। ইহা ঈশ্বরকে সেকেলে অনুমান বা মানুষকে অহঙ্কারী জীব বলিয়া মনে করে না—মূল্যের ক্ষেত্রে উভয়ের ঐক্যকে স্বীকার করে। ইহার মতে, ব্যক্তিগত ও সমাজগত নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকিলে মানবজীবন একটি বিরাট মিথ্যায় পরিণত হইবে। ব্যাপক কর্মের সীমার বাহিরে কোনো নীতি নাই, সুতরাং ব্যাপক প্রচেষ্টার মধ্যেই মানুষের সিদ্ধি। প্রত্যেক মানব আদর্শলোকের যাত্রী এবং নৈতিক বলই সেই দুর্গম পথযাত্রার পাথেয়—ইহাই গান্ধীজীর পরম শিক্ষা। এই আদর্শ অনুসারে কর্মের দ্বারাই মানুষের পরিচয় ; উহা তাহার সম্মুখে কতকগুলি স্পষ্ট ও সরল সত্যকে উপস্থাপিত করিয়াছে।

গান্ধীজীর মত মহা দার্শনিকই জগৎকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিতে পারেন যে, বিশ্বমানবের হিতসাধন না করিলে উহাকে আত্মহত্যা করিতে হইবে। মাটির কুটীরে বসিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, পৃথিবীর অন্তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে ; বাহির হইয়া আসিয়া তিনি মানবের সমগ্র রূপটি আবিষ্কার করিলেন এবং উহার নিকট আবেদন জানাইলেন। মানুষের মালিন্য ও পশুপ্রবৃত্তি

দূর করিবার জন্য তিনি অহিংসা পরশমণির ব্যবহার করিলেন। গান্ধীজী-পরিকল্পিত 'আদর্শ মানব' সংগঠিত সারবস্তু রূপে আবির্ভূত হইল।

মানুষ কোন্ জিনিষটিকে গ্রহণ করিবে তাহার উপরই স্বাধীনতার প্রশ্ন নির্ভর করে, এবং মানুষের পছন্দ বিশ্ব-রূপের সহিত সম্পর্কিত। গান্ধীজীর সাবলীল, সুসঙ্গত চিন্তাধারা এই বিশ্বাস লইয়া সকল সমাধানগুলি রচনা করিয়াছে। মানবজীবনের সারতত্ত্ব এবং ঐক্যকেই মনোনীত করা হইল। জীবনকে সফল অথবা বিকৃত করার ভার মানুষের নিজের উপরেই। যখন সে সত্য এবং সর্বমানবের বেদনার দিকে নিজেকে প্রসারিত করে তখন এই সীমা-অতিক্রম তাহার বোধিকে জাগ্রত করিয়া দেয়।

গান্ধী-দর্শন মুক্তির মুক্ত বাতাসে বর্দ্ধিত এবং সার বস্তুগুলির মধ্যে উহার মূল নিহিত। যে হ্রস্বদৃষ্টি রাজনীতিকরা ইহার প্রাথমিক নীতিসমূহকে দেখিতে পায় না তাহাদের মতামতের উপর এই তত্ত্ব নির্ভর করে না। সত্যের শক্তি যখনই মানুষের বিচিত্র খেয়ালের প্রতিরোধকে সৃষ্টি করে তখনই এই আদর্শ নূতনতর অর্থে গরীয়ান্ হইয়া উঠে। জীবনকে উচ্চতর মূল্যের নিকট নতিস্বীকার করাইয়া ইহা এক অতুলনীয় গরিমার সৃষ্টি করে। ইহার আধ্যাত্মিক নীতিগুলির বিশেষ শক্তি ও আবেদন আছে; উহা সর্বত্র মানুষের উত্তরাধিকারকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে।

অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক পটভূমিকায় একটি আদর্শের প্রয়োজনীয়তা উহা কতখানি সাড়া জাগাইতে সক্ষম তাহার উপর নির্ভর করে। যদিও গান্ধীবাদ কোনো নির্দ্দিষ্ট মতের অচলায়তন নয়, তবুও ইহার মহৎ উপদেশগুলি বিশেষ যত্নের সহিত চর্চ্চা করিবার প্রয়োজন হয়। গান্ধীজী তাঁহার যোগদৃষ্টিতে পরম সত্য ও আপাত সত্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখিতেন না; তিনি ভীরুতা ও অবিশ্বাসকে সকল দুঃখের মূল বলিয়া

মনে করিতেন। তাঁহার জীবনের বিরাট্ ঘটনাবলীর উপর সেতু রচনা করা এবং উহাদের অন্তর্নিহিত সত্যকে আবিষ্কার করা দৈবশক্তি-সম্পন্ন সাহিত্যস্রষ্টার কর্ম। মানুষের ইতিহাসে, এক বিশেষ অর্থে গান্ধীজীই সর্ব্বোত্তম মহাপুরুষ। তিনি প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে শাশ্বত সত্যে বিশ্বাসী হৃদয়, প্রেমের স্পন্দনে ছন্দিত শ্রবণ, এবং একমাত্র লক্ষ্য অভিমুখী মন মানুষকে পশুশক্তি, উহার বিভীষিকা ও প্রলোভনকে জয় করতে সমর্থ করে।

মহাত্মার ওষ্ঠ হইতে কখনও অপ্রীতির বাণী উচ্চারিত হয় নাই। তাঁহার শান্ত নয়ন হইতে সত্যের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইত। তিনি দৈহিক কামনা বাসনার মুলকে বিনষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মা একটি গুপ্ত উৎস হইতে জীবনীশক্তি আহরণ করিত। তাঁহার কণ্ঠে শত শতাব্দীর আদর্শবাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। একটি মহৎ সম্ভাবনার চিহ্নরূপে আকাশে উদিত হইয়া তিনি সহসা অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তিনি এমন কোনো বিশেষভাবে দীক্ষিত শিষ্য রাখিয়া যান নাই যিনি জগৎকে প্রবঞ্চনা করিতে সক্ষম। চিরন্তন নির্ঝরের মত গান্ধীজীর দর্শনও চিরকালের। লক্ষ লক্ষ মানুষ উহার মধ্যে তাহাদের কমণ্ডলু ভবিয়া লইতে পারে। যদি কাহাবও মধ্যে মনুষ্যত্ব ও কোমলতা বর্তমান থাকে তাহা হইলে ঐ স্বচ্ছ বারি সেই গুণকে সরস করিয়া তুলিবে। সংহত মনের দৃষ্টিতে এই আদর্শের মধ্যে ধর্মশাস্ত্রের সঠিক ও গভীর ভাব বর্তমান। ইহা বিতর্ক ও বাগাড়ম্বরশূন্য অনুভূতি—প্রচণ্ড এবং গতিশীল।

আমাদের চোখের সামনে গান্ধীজীর অক্ষয় জীবনকে ধরিয়া রাখাই যথেষ্ট নয়। যদি তাত্ত্বিক ও সমালোচকরা গান্ধীবাদকে বৈপ্লবিক বোধের ভিত্তি করিয়া লন তাহা হইলে ঐ জীবনকাহিনী নূতন বিশ্ব-গঠনের প্রেরণাস্বরূপ হইতে পারে।

গান্ধীজীর প্রচণ্ড প্রেম তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছিল। যে সত্যের জন্য তাঁহার রাত্রি-জাগরণ এবং বেদনা-বরণ, পরীক্ষা এবং

প্রচার—সেই আলোক সকল ঐতিহ্যের মধ্যেই বর্তমান! বস্তুতন্ত্রের লোভনীয় বন্ধন, বিরাট সাম্রাজ্য এবং পাশবিকতা হইতে ইহা মানুষকে প্রকৃতি ও ইতিহাসের ছন্দের দিকে, আত্ম-সামঞ্জস্যের পথে লইয়া যায়।

লোভ ও হিংসা, স্বার্থ ও অস্ত্রের দ্বারা বিধ্বস্ত জগৎকে প্রীতির নব বিস্তারই রক্ষা করিতে পারে। সংকীর্ণ জাতিগত, সাম্রাজ্যবাদী শান্তি-প্রস্তাব বেলুনের মত ফাঁপিয়া উঠিয়াছে—লোকের মনে উহা ফুটা করিয়া দিবার লোভ জাগে। স্বাভাবিক মানুষের স্থান আজ রাজনীতিক গ্রহণ করিয়াছে; হিংসার ধ্বংসস্রোতে সে নিমজ্জমান। মানবের পটভূমি আজ বেদনাবোধের দ্বারা অভিশপ্ত। নীতিজ্ঞানের মূল হইতে ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া শান্তির ধারণা নূতন প্রকাশভঙ্গীর স্তরে পৌছিতে পারে না।

আজ অধর্মের বিরুদ্ধে অভিযানের বিশেষ প্রয়োজন। প্রচলিত মতবাদগুলি কর্মের ভিত্তিতে রচিত নব সমন্বয় সৃষ্টি করিতে অক্ষম হইয়াছে। আমরা শুধু যুক্তিবিহীন কুসংস্কার ও পরস্পব-বিরোধী লক্ষ্যের কোলাহল শুনিতে পাইতেছি। বাগাডম্বর ও পরিহাস, মত্ত রক্ত-পিপাসা, ক্রুশকাষ্ঠবাহী জনতা, বিভীষকাময় শিবির এবং অন্তঃসারশূন্য প্রচার আধুনিক জীবনযাত্রার পরিবেশ রচনা করিতেছে। আত্মার সংগঠনে কর্মের কোনো পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। রণক্লান্ত মানুষ যে ভূমির উপর দাঁড়াইয়া আছে, নাস্তিক্য বুদ্ধি তাহার নীচেকার মাটি কাটিয়া ফেলিতেছে। রাজনীতিক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করিবার আগ্রহে দর্শনতত্ত্বগুলি আজ যুদ্ধক্ষেত্রের পূতিগন্ধময় পরিখার মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

গান্ধীবাদ বিশ্ব-আত্মার জীবন্ত রক্ষাকবচ—এই সত্য ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীদের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। গান্ধী-পরিকল্পিত আদর্শলোকের অক্ষ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। আধ্যাত্মিকতা একান্তভাবেই ভারতীয়। গান্ধীজীর উৎসর্গীকৃত অন্তরের মধ্যেই উহার সূক্ষ্ম মাধুর্য বর্তমান। গান্ধীবাদ

পৃথিবীর জাতিগুলিকে একটি আদর্শ ও সভ্যতার প্রেরণা দিতে সক্ষম। তাঁহার প্রতীকগুলির শরণ না লইয়া তিলমাত্র সমন্বয় সাধন করা জগতের পক্ষে অসম্ভব। কোনো বিশেষ ঐতিহ্যের ক্ষতি না করিয়া উহারা আত্মার বিশ্বজনীনতাকে আবিষ্কার করিতে পারে। বিশ্ব-সংস্কৃতির ফুলদলকে যাহা বর্ণাঢ্য চিত্রে সমন্বিত করে—গান্ধীবাদ সেই সমন্বয়শক্তির যাদুমন্ত্র।

ভূমিকা

কৃষ্ণমূর্তি গান্ধীজীর অহিংসা নীতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী। গান্ধীবাদ প্রচার কল্পে তিনি অনেক দিন ধরিয়া একটি "গান্ধী ইন্‌ষ্টিটিউট্" প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করিতেছেন। এই প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি যাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়াছেন আমি তাঁহাদের অন্যতম। সাধারণভাবে প্রচারের যাহা অর্থ তাহাতে আমার আস্থা নাই; আমার মতে, কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে পবিত্র এবং মূল্যবান্ ভক্ত জীবনের জীবন্ত উদাহরণই সর্বাপেক্ষা কার্যকরী। স্নুতরাং, আমরা যাহারা কামনা করি গান্ধীজীর আদর্শ জয়যুক্ত হউক—আমাদের কর্তব্য নিজের জীবন পরিশুদ্ধ করিতে চেষ্টা করা এবং জনসাধারণকে প্রীতি ও নিঃস্বার্থ সেবা দান করিয়া সেই আদর্শের অনুকূলে তাহাদের লইয়া আসা।

তবুও আমি মনে করি, তিনি যে ধরণের প্রতিষ্ঠানের কথা বলিয়াছেন তাহার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা গান্ধীজীর খুব নিকটে ছিলাম বলিয়া তিনি যে বিরাট্ শক্তির অধিকারী ছিলেন এবং যাহা আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। বিনা রক্তপাতে অহিংসার অস্ত্র দ্বারা আমাদের জন্য স্বাধীনতা অর্জ্জনের মধ্যে এই প্রচণ্ড শক্তি আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় নানাবিধ বিশ্বসমস্যা সমাধানে 'অহিংসা'র জীবন্ত আদর্শের প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয় নাই। অন্যত্র ব্যবহারের পূর্বে স্বদেশে ইহার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দেখিবার জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার কামনা অনুযায়ী গান্ধীজী যদি ১২৫ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতেন, তিনি বিশ্বশান্তি স্থাপনের জন্য বিশ্ব-শক্তিগুলিকে প্রয়োগ করার সময় পাইতেন; কিন্তু তাহা হইবার নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের অর্থাৎ তাঁহার আশু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে মৃত্যুবরণ করিতে হইল। যে অন্যায়ের স্রোত অভূতপূর্ব ভাবে আমাদের দেশকে গ্রাস

করিয়াছে তাহা রোধ করিবার জন্য জীবনের শেষ দুই বৎসর গান্ধীজীকে কর্মব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। যে দেশ অতীতকালের মহা ঋষিদের নিকট হইতে প্রাপ্ত শান্তি-মৈত্রীর মহৎ আদর্শকে লইয়া গর্ব অনুভব করিত সেই স্থানে এই অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হওয়ায় তিনি আঘাত বোধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা অন্তর্হিত হইয়াছিল। তিনি চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার আদর্শ এখনও বর্তমান; ইহাকে বিশ্বশক্তিতে রূপান্তরিত করিবার দায়িত্ব আমাদেরই।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার ঘনসান্নিধ্যে আসার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহার গৌরবময় জীবনের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে—ভবিষ্যদ্বংশীয় এবং বাহির বিশ্বের হিতার্থে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত উপদেশাবলী সংগ্রহ ও একত্রিত করা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। অবিলম্বে যদি এই সংগঠনের কাজ সুরু না হয় তবে ইহা কখনই হইবে না বলিয়া মনে হয়; কারণ তাঁহার নিকট-সঙ্গীদের সংখ্যা দ্রুত কমিয়া আসিতেছে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহারা চলিয়া যাইবেন—তখন এই অতি প্রয়োজনীয় কাজ করিবার জন্য কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না।

অবশ্য 'সর্বোদয় সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কৃষ্ণমূর্তি-পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানটি উহারই একটি অংশরূপে কাজ করিতে পারে। এই প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত যোগ রক্ষা করিবে; আবার তাঁহাদের মধ্য দিয়া জাতীয় জীবনের প্রতিটি দিক্ গান্ধীদর্শনের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইবে। ইহা গান্ধীবাদের রসে পুষ্ট নব সাহিত্য, নাটক, সংগীত, চিত্রকলা, নৃত্য এবং কাব্য সৃষ্টি করিবার আশা পোষণ করে। গান্ধীসাহিত্য অধ্যয়নের জন্য একটি বিদ্যায়তন এবং গান্ধীদর্শন অধ্যাপনার জন্য বিভিন্ন বিশ্ব বিদ্যালয়ে অধ্যাপক-পদ প্রবর্তনের প্রস্তাব হইয়াছে।

গান্ধীজী প্রীতি ও শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার নূতন জগৎ

স্বজনের স্বপ্ন দেখিতেন। শোষণের শক্তিগুলিকে বিনষ্ট করাই ছিল তাঁহার কাম্য—আধ্যাত্মিক প্রভাব ও ব্যক্তির সংস্কার—এই ছিল উহার পথ। ইহা তাঁহার সংগঠনমূলক সব কাজেরই লক্ষ্য। খাদি ও চরকা, গ্রামোদ্যোগ এবং হরিজন-সেবা—সকলের উদ্দেশ্য এক।

তাঁহার শেষ দান 'নঈ তালিম' সেই সামাজিক রূপান্তরের লক্ষ্যে পৌঁছাইবার একটি মহৎ প্রচেষ্টা। তাঁহার পরিকল্পনার মধ্যে ধনী-দরিদ্র বা শহরবাসী-পল্লীবাসীর কোন প্রভেদ নাই। অল্প বয়স হইতে শিশুদের ভার লইয়া সকলকে একই ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে। উহারা দৈহিক পরিশ্রমকে ভালবাসিতে, শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য গান্ধীজী-পরিকল্পিত অহিংস সমাজের জন্য নূতন বংশধরদের প্রস্তুত করা। 'নঈ তালিমে'র কাজ এখনও প্রথম অবস্থায় রহিয়াছে। প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটি কিশোরোপযোগী সাহিত্য রচনা করিয়া এই আদর্শ শিক্ষার প্রসারে সহায়তা করিতে পারে।

গঠনকর্মীরা সকলেই জানেন যে বর্তমানে আমাদের দেশ অতিশয় দুর্নীতির স্তরে নামিয়া গিয়াছে। সারা জীবন ধরিয়া গান্ধীজী যে সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন আজ তাহারই প্রাচুর্য সবচেয়ে বেশি। ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ, আত্মীয়-তোষণ, দুর্নীতি, উৎকোচের প্রসার, কালোবাজারী বৃত্তি প্রভৃতিই বর্তমানে প্রচলিত রীতি।

ইহার প্রতিরোধকল্পে প্রচণ্ড চেষ্টা থাকা প্রয়োজন। যদি এই প্রতিষ্ঠানটি যোগ্য এবং প্রভাবসম্পন্ন লোকের হাতে থাকে, ইহার অসাফল্যের কোনো কারণ আমি দেখি না। এক যুগের মধ্যেই যখন কমিউনিজম্, ফ্যাসীবাদ এবং নাৎসীবাদ জীবন্ত বিশ্বশক্তিতে পরিণত হইতে পারিল, তখন আমরা যদি গান্ধীবাদের কল্যাণকর শক্তিকে প্রয়োগ করিবার জন্য সেই সংগঠনরীতি গ্রহণ করি

আমরা নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করিব। আমাদের সুবিধা এই যে, আমরা যে আদর্শ ও তত্ত্ব প্রচার করিতে চাই তাহা প্রকৃতপক্ষে শুভ—ইহার লক্ষ্য 'সর্বোদয়' অর্থাৎ সর্ব্বজনের হিত। আমাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে যে উপায়েব সামঞ্জস্য নাই তাহা গ্রহণ করিতে আমরা অনিচ্ছুক। আমরা দৈহিক শক্তির ব্যবহার করিব না বটে কিন্তু আদর্শানুগ সহযোগিতা ও সংগঠন একান্ত প্রয়োজনীয়। শিল্প, সাহিত্য, চিত্র, নাট্য ও সঙ্গীতের দ্বারা কতখানি সিদ্ধিলাভ করা যায় জয়পুরের 'সর্বোদয় প্রদর্শনী' এবং রাজঘাটের 'গান্ধী মণ্ডপ প্রদর্শনী' তাহা প্রমাণ করিয়াছে।

কৃষ্ণমূর্তি যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার সম্ভাবনা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য এবং ঠিক পথে পরিচালিত করিবার জন্য আমি সর্বোদয় সমাজের নেতৃবৃন্দের নিকট আবেদন জানাইতেছি। যাঁহারা ইহাকে কার্যকরী করিতে উদ্যোগী হইবেন তাঁহাদের উপরেই সফলতা নির্ভর করিতেছে। ইহাতে গান্ধী স্মৃতিভাণ্ডারের একাংশ সদ্ব্যবহার করিবার শ্রেষ্ঠ সুযোগও মিলিবে।

আমি আশা করি, প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের কাজে উপযুক্ত ব্যক্তিরা আত্মনিয়োগ করিবেন।

নিউ দিল্লী

২৬-৬-১৯৪৯ রামেশ্বরী নেহেরু



—গান্ধীবাদ জয়ী হইবে—

গান্ধীবাদের সাহায্যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ধ্বংস ও দাসত্বের স্রষ্টারা আগুন ও বুলেটের অক্ষরে ইহার সুদৃঢ় জাতীয়-বোধের প্রতিবাদ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সমগ্র রীতির মূলে বৈপ্লবিক প্রেরণা বর্তমান। মহাত্মা বহু তরুণের দৃষ্টি পূর্ণ সত্যের সৌন্দর্যের দিকে উন্মীলিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, ইতিহাসের রূপ—উৎপাদন কিংবা আধুনিক প্রক্রিয়ার মধ্যে বর্তমান থাকে না। থাকে আত্মিক স্বদেশপ্রীতির মধ্যে। তাঁহার নীতি হৃদয়াবেগ, চরম প্রকাশ, সুদৃঢ় আদর্শবাদ ও সূক্ষ্ম বিচারের সূচনা করে।

গান্ধীজী তাঁহার বিষম নিয়তিকে স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছিলেন; শয়তানের কার্যগুলি হত্যাকারীই সম্পন্ন করিল। যমুনার তীরে বসিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্রন্দনরত; লেলিহান অগ্নিশিখা বিপ্লবী পিতার বীর্য-সমন্বিত দেহ গ্রাস করিল। গান্ধীজী স্বীয় নীতি অনুযায়ী পারিপার্শ্বিককে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন। একটি জীবনকালের মধ্যে সকল হংসকে রাজহংসে রূপান্তরিত করা কেমন করিয়া সম্ভব! তাঁহার ও বাস্তব জগতের মাঝখানে কোনো আবরণই নাই বলিয়া তিনি বর্তমান যুগের লোকদের নিকট মানুষের ধর্মকে রক্ষা করিবার আহ্বান জানাইলেন।

গান্ধীজীর ভারতবর্ষে দেখা যায়, বীর্যবান ধীর সাহসী ব্যক্তিরা এই চিরন্তন সত্যের রত্নভাণ্ডারের প্রতি তাঁহাদের ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহাদের বিচারবুদ্ধি ক্ষণস্থায়ী নয়, কোনো তিক্ত বিড়ম্বনাই তাঁহাদের নৈতিক স্থৈর্যকে বিনষ্ট করিতে পারে না। অবশ্য বহু ঘটনাবলাই তাঁহারা স্মরণ করিয়া থাকেন—দুঃখের ছায়া তাঁহাদের উপলব্ধিকে ঘেরিয়া থাকে। শক্তিমান যাদুকরের অবর্তমানে তাঁহাদের চোখের সামনে ভয়ঙ্কর মূর্তি, উপপ্লব এবং

সংকটের কালোছায়া ফুটিয়া উঠিতেছে। লোভনীয় শিখরাভিমুখে তাঁহাদের তীর্থযাত্রা ক্ষণিকের নয়। তাঁহারা পাহাড় কাটিয়া নূতন পথ প্রস্তুত করিয়া দুর্গম চূড়া অতিক্রম করিবেন।

সংকটময় বর্তমান কালে সত্যই মহাকাব্য সৃজনের নক্ষত্রলোক স্পর্শ করিবার উপযোগী সময়। আজ স্বাধীনতা এবং উত্তরাধিকার বিনষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। ভারতের মাটির সৌন্দর্য, আমাদের প্রিয় জন্মভূমির শোভাকে নিছক সাহিত্যবোধ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। ফলে বহুবিস্তৃত ভূমি তরবারির অনুশাসনাধীন হইয়া পড়ে। ঘৃণিত সাম্প্রদায়িক প্রচারের কলুষ, এবং সত্য ও আশার উৎস-বিনাশ সম্পর্কে শান্ত চিত্তে কিছু পরিচয় দেওয়া বাস্তবিক কঠিন। এই বেদনাময় যুগের ভাণ্ডার—লুণ্ঠন ও লজ্জার ফসলে পরিপূর্ণ, জীবনের আদর্শ ও আত্মিক সম্পদ আজ অন্ধকারের মধ্যে আচ্ছন্ন। চরম বর্ব্বরতা মাটিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের অস্থি রোপন করিতেছে—দেশ বিভাগের বীভৎস নীতি পাঞ্জাব, পূর্ব্ববঙ্গ ও সিন্ধুর ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিল।

ঐক্যের কল্পনায় আমাদের চির-আনন্দ, আমাদের ভৌগলিক ও রাজনৈতিক নিয়তির শাশ্বত আকর্ষণ, শত শতাব্দীর ঐতিহ্যের ঐশ্বর্য ও রহস্য, বীরত্বগাথা ও অতীত কাহিনীর মনোমুগ্ধকর বর্ণবিন্যাস এবং শ্যামল ভূমির রূপমাধুর্য আজ বস্তুতান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক অব্যবস্থায় পর্যবসিত। আমাদের জননী এই বসুন্ধরা যিনি রামধনুর রঙে আশা জাগাইয়া তোলেন, ঋতুরঙ্গের মধ্যে স্থৈর্যের আলোক প্রকাশিত করেন, পুষ্পদলের শিশিরকণায় জীবনের রহস্য লুক্কায়িত রাখেন—আমাদের সদা-প্রস্তুত মতবাদ ও ধারণা তাঁহার নিকট উপহাসের বস্তু হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি! বড়ই দুঃখের বিষয় যে ভেদ-বুদ্ধি-প্রসারী ঘটনা ও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। নেতারা ভূতাত্ত্বিক রাজনীতির পরীক্ষা ও আশা ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া জনসাধারণ বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন চালনা করিতে অসমর্থ। যে আদর্শ সূক্ষ্ম-অনুভূতিসম্পন্ন

হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহা শক্তিমদমত্ত মানুষের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যায়। অন্তঃসারশূন্য চিন্তা এবং অজ্ঞতার আকর্ষণই ইহাদের উপজীব্য।

সাময়িক ঘৃণা, স্বার্থপরতা এবং জনহত্যার উপর শাশ্বত প্রেম কি জয়ী হইবে? রক্তপিপাসু মানুষ সামাজিক কল্যাণ ও ধার্মিকতার কল্পিত পার্থক্য কি ভুলিতে পারিবে? প্রীতির রহস্যজ্ঞানী একমাত্র আদর্শবাদী পুরুষকে আমরা যখন হারাইয়াছি তখন এই সকল প্রশ্নের উত্তর কোথায় মিলিবে? লক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট গান্ধীজীর প্রার্থনান্তিক ভাষণগুলি বাহ্যিক নীতিকথা নয়, উহার মধ্যে আশ্বাস ও গভীর আন্তরিকতার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠে। আমরা এমন একটি দিনের কল্পনাও করিতে পারি না যখন তাঁহার চিন্তাধারার প্রভাবমুক্ত হইয়া বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর।

উদার অর্থে, গান্ধীবাদের মধ্যে পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করাই অবিচ্ছিন্নভাবে মুক্তির স্বপ্ন-দর্শন। এই আদর্শটি আশা জাগায়, অতীত দৃশ্যের পুনঃপ্রকাশ করে এবং সকল বস্তুতে প্রাণসঞ্চার করিয়া দেয়। ইহার মধ্যে বৈদিক সামগানের আভাষ, বিস্তৃত হিমালয়ের অরণ্য-কুসুমের সৌন্দর্য্য, মসৃণ মুকুরের সুস্পষ্ট প্রতিফলন। এই রহস্যবাদের মধ্যে চিন্তার পীড়ন নাই, ইহা একটি মনোমুগ্ধকর আদর্শলোক। মানুষকে প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকিয়া এবং তাহাকে যন্ত্রের অংশ-বিশেষে পরিণত করিবার প্রচেষ্টাকে বাধা দিয়া ইহা আমাদের নিকট জীবনের একটি নূতন ছন্দ উপস্থাপিত করিয়াছে; সেই ছন্দের মধ্যে আত্মার গতি ও স্পন্দন রহিয়াছে।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে গান্ধীবাদ বস্তু হইতে প্রাণে, বাহির হইতে অন্তরে যাত্রা। চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে ইহা সৃষ্ট জীবের প্রতি উদার কর্তব্যবোধ জাগ্রত করিয়া দেয়। দার্শনিক দৃষ্টিতে ইহা জগৎ এবং জীবনকে আত্মোপলব্ধি বলিয়া স্বীকার করে। গান্ধীবাদ অন্তর্দৃষ্টি এবং পরীক্ষার মধ্যে যোগ সৃষ্টি করে, এবং ইহার মতে দর্শনের দ্বারাই

মানুষের পক্ষে সামগ্রিক জীবনের সত্য লাভ সম্ভবপর। সচেতন আত্মার ইচ্ছাতেই সকল গভীর পরিবর্তন সংঘটিত হয়। অতএব যে মতবাদ অন্তরের সাক্ষ্যকে অস্বীকার করে তাহা জীবনের মূল উপাদানকে বিকৃত করিয়া ফেলে। গান্ধীবাদের দার্শনিক প্রচেষ্টার মূল কথা—আত্মিক শক্তি নব নব অসীম দিগন্তকে উদ্‌ভাসিত করিয়া দেয়। যখন মানুষ নিজেকে পাশবিক এবং যান্ত্রিক স্তর হইতে উন্নীত করে তখন সে প্রকৃতি ও ইতিহাসের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। তাহাকে সত্যের প্রকাশরূপে দেখিতে পাই।

জীবনের সমন্বিত রূপ, আত্মিক ঐশ্বর্য, বিভেদের সামঞ্জস্য-বিধান, নিরূপণ-তত্ত্বের প্রতিবাদ এবং নীতির ভিত্তি হিসাবে স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বীকার—এইগুলি গান্ধীবাদের মূল চিন্তাধারা। শান্তির অন্তর্নিহিত সত্যকে দেখিতে পায় বলিয়া কেবলমাত্র নৈতিক বোধই জগৎকে রূপান্তরিত করিতে পারে—এই তত্ত্ব সেই আদর্শের বজ্রভেবীতে ঘোষিত হয়।

প্রধান প্রশ্ন এই যে—গান্ধীবাদ কি মানব জীবনের পটভূমি হইতে পারে? আমাদের দেশে ইহা চিন্তা, মুক্তি ও দৈনিক সংগ্রামের ভিত্তিস্বরূপ। অবশ্য গান্ধীজীর নৈতিক বোধকে অনুভব করার শক্তি দেশবাসীর একাংশের আছে মাত্র। কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদের ঘটনাবলী দেখিয়া অনেকে মনে করে—গান্ধীবাদ আত্মপ্রবঞ্চনা ভিন্ন আর কিছু নয়। ইহার নিয়মানুবর্ত্তী নৈতিক শক্তি-শৌর্য ও আন্তরিকতাকে তাঁহারা প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইয়া আত্ম-আবিষ্কারের পথে যাত্রা করিতে তাঁহারা অনিচ্ছুক।

তাঁহাদের যুক্তি এই যে, যতক্ষণ না বর্বরের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে রোধ করা যাইবে ততক্ষণ ভারতবর্ষ আপন নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না। যে দুর্বৃত্তের দল সংস্কৃতি ও শিল্পকে ধূলি ও ভস্মে পরিণত করে, যাহারা উন্মত্ত হইয়া হিংস্র লুণ্ঠনে

প্রবৃত্ত হয়, যাহারা ঐতিহাসিক মিথ্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে আপন শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে—তাহারা প্রেমের সমাচারকে মানবের পরম আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। যদি আমরা সংখ্যালঘু একটি দলকে বিদেশী চক্রীদের পাপাজ্ঞা বহন করিবার সুযোগ দিই, উহার ফল সাংঘাতিক হইবে। ইহার অর্থ এই নয় যে, আমরা দয়া, বিশ্ববোধ এবং উদার সত্যের পথ হইতে বিচ্যুত হইব। মূল কথা এই যে, বিশ্বাসবিহীন ব্যক্তি নৈতিক উপদেশকে অগ্রাহ্য করে, চিন্তার মাধুর্যকে ঘৃণা করে এবং শেষ বিচার-দিবসের পরের দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে।

যাহারা কসাই-বৃত্তি এবং অন্ধ উন্মত্ততার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহাদের নীতিগত বাস্তববুদ্ধির সহিত পরিচয় আছে। মানুষের নিয়তিকে জয়যুক্ত করিবার জন্য হাজার হাজার নাম-না-জানা যে সব সাহসী তরুণ প্রীতির রসে অভিষিক্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে তাহাদের অস্বীকার করা মূর্খতার পরিচায়ক। পশুশক্তির রাজ্যবিস্তার বেশীদিনের নয়—এই বিশ্বাসে তাহারা অটল থাকে। তাহারা জানে ইতিহাসের প্রতি যুগেই অসাধু ও দুর্বৃত্তের দল আছে এবং ঘটনার চক্রগতি অবশ্যম্ভাবী। পুনরভ্যুদিত ভারতের সন্তানরূপে তাহারা দণ্ডের আঘাত গ্রহণ করে—বর্বরের শিবিরে তাহাদের প্রতিবাদ-ধ্বনি উত্থিত হয়।

যাহারা নৈতিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করিতে গিয়া আত্মদান করে তাহাদের ইতিহাসকেই আমরা গভীরতম অর্থে বাস্তব বলিয়া অভিহিত করিব। সৃষ্টির প্রেরণায় তাহারা কাজ করিয়া যায়, মৃত্যু বা ধ্বংস তাহাদের ভীতি উৎপাদন করিতে পারে না। পূর্ণ প্রেম ও শক্তি সত্যের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ এবং কর্মবীর—এই তিন রূপের প্রকৃত সমন্বয় গান্ধীজী আমাদের দেখাইয়াছেন। হয় বেদনা-বরণকারী প্রেমের দ্বারা অথবা অস্ত্রশক্তির সাহায্যে সংস্কৃতি-ধ্বংসপ্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য তিনি আমাদের বিশেষভাবে বলিয়াছেন।

এক বিরাট্ পটভূমিকায় অহিংসার আদর্শ আরোপিত অর্থ এবং অস্বাভাবিক ক্লান্তি হইতে মুক্ত।

গান্ধী-প্রচারিত তত্ত্বগুলির অন্তর্নিহিত সুরটি এই যে, প্রেমের সীমানার বাহিরে কোনো রাজনীতি নাই। ইহার মধ্যে নীতিবাদ ও ঐতিহাসিক গতি মিশিয়া গিয়াছে, প্রেম ও সত্যের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। নৈতিক ভাব চাঞ্চল্যকে স্থৈর্যে এবং উন্মত্ততার বিষদন্তকে করুণার প্রতীকে রূপান্তরিত করিয়া দেয়। দুর্বৃত্তের শাসন, নরবলি, সভ্যতার মন্দির-লুণ্ঠন ও মৃত্যুপথযাত্রাই আজ ইতিহাসের ঘটনাবলী। অথচ নৈতিক ভাবের অনুসন্ধান, আত্মার প্রগতি, শৌর্যময় আত্মবলিদান এবং রাজনৈতিক ধর্মস্বরূপ মুক্তি-চেতনা প্রকৃত ঐতিহাসিক ক্ষণের নির্দ্দেশ করে। পশু-শক্তির স্বীকৃতি ইতিহাসগত সত্যের বিপরীত। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে পাশবিক শক্তি নূতন পোষাক পরিয়া আবির্ভূত হয় এবং নিজেকে অপরাজেয় বলিয়া দাবী করে। কিন্তু যে একটিমাত্র নৈতিকভাব বিশ্বজনীন ও মৃত্যুহীন, যাহা গভীরতম অন্ধকারের মধ্যেও ভাবী জীবনের সূচনা করে—তাহা সেই নীতি, যাহার স্পর্শে গোলাপ এবং কণ্টক একই সঙ্গে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। এই নীতিগত আদর্শের সন্ধান মনস্তত্ত্বের নানা মতের মধ্যে বা রাজনীতিক্ষেত্রের দলগত সম্মেলনের ভিতরে পাওয়া যায় না—উহা রহস্যবাদীর রক্তস্রোতের মধ্যে প্রবাহিত থাকে।

যাহারা শতাব্দীর কথা ভাবিয়া বিচার করেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে মার্ক্সীয় মতবাদ ও মারণযন্ত্রের মধ্যে জগতের কোনো কল্যাণ নাই। গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন প্রকারের ধর্মান্ধতা শক্তির সিংহাসনে আরূঢ়। এই সব মতবাদ মানুষের চিন্তাশক্তিকে বিনষ্ট করিয়া দেয়। তাদের দেহ এবং স্নায়ুর উপরও প্রচণ্ড পাপ পড়ে। স্বভাবতঃই অভ্যাসদোষ বশতঃ সে উচ্চতর জীবনবোধকে উপলব্ধি করতে পারে না। মানুষ গণতান্ত্রিক শক্তির পরিবর্তে ক্রমবিকশিত অনিশ্চয়তার পথে চলিতেছে। আজ শাসন-তন্ত্র অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম-অনুভূতিসম্পন্ন

মহাপুরুষদের ঘৃণা ও উপহাস করিতেছে—মানুষ আপন সংকটময় পরিস্থিতির ভীষণতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। যে দর্শনতত্ত্ব তাহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে তাহাকে অন্তঃসারশূন্য মতবাদ বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখা হইতেছে।

সমালোচকরা জানেন, কল্পনাবাদীই ইতিহাসের সমগ্র পটভূমিকে সৃজন করে, রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি শুধু একটি তত্ত্বকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। প্রথম জনের দৃষ্টিতে একটি প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত রূপটি স্পষ্টই প্রতিভাত হয়, দ্বিতীয় জনের বিশ্বাসহীনতা আদর্শকে নীরবতার গহ্বরে প্রোথিত করিয়া দেয়। রাজনীতিক স্বার্থ এবং আশার দোদুল্যমান জগতে বাস করে। কল্পনাপ্রবণ মন এই কম্পমান ভূমি হইতে সরিয়া পরম মূল্য বিচারের আঙিনায় বিচরণ করিতে থাকে। গান্ধীজীর মৃত্যুবরণের পর রাজনীতিক যে তাঁহার আদর্শের বৈপ্লবিক ধারাকে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি! গভীরতম স্তরে জীবনকে সমন্বিত করিতে রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি যে অকৃতকার্য হইয়াছেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাজনীতিকের সমগ্র জাতটির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা অন্যায়, কিন্তু আশঙ্কার ব্যাপার এই যে, তাঁহারা জনসাধারণকে অন্ধকারময় পথে চালিত করিতেছেন। ইহা আজ নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের পরশ্রীকাতরতা, মিথ্যাচার প্রমুখ অসদ্‌গুণ আমাদের আদর্শের অটুট ভিত্তিকে বিষাক্ত করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা আমাদের নিকট তত্ত্বের পরিবর্তে অর্থহীন বক্তৃতা, সুন্দর চিন্তার পরিবর্তে বিকৃত মস্তিষ্কজাত বাক্য উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যদি ঐ রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা জীবনের নূতন পরিকল্পনা দিতে পারেন এবং মানুষের দুঃখভার সম্পর্কে অবগত থাকেন তাহা হইলে সমগ্র জাতি তাঁহাদের নিকট শ্রদ্ধায় মাথা নত করিতে প্রস্তুত। অন্যান্য জাতিরা যে সময় দ্রুত বেগে ছুটিয়া চলিতেছে, তখন আমরা সত্য অস্বীকারের ফলস্বরূপ অর্দ্ধেক পথও অতিক্রম করিতে পারিলাম না।

ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, স্বাধীন ভারতের সমস্যা অন্তরের সমস্যা—উহার সমাধান নীতির রাজ্যেই খুঁজিতে হইবে! আমরা যদি মানুষের মনকে সংগঠিত করি এবং ইহাকে সমসাময়িক নীতি ও সামাজিক প্রয়োজনের অনুগামী করিয়া তুলি তাহা হইলে আমরা বর্বরতর যুগের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ার বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারি। আজ চিন্তার স্রোতকে নূতন গঠন-পরিকল্পনার দিকে প্রবাহিত করিতে হইবে। ভীরু মত-পরিবর্তনের দ্বারা ইহা সম্ভব হইবে না, ইহার জন্য বিরাট কল্পনার উৎসাহের প্রয়োজন। নিষ্ক্রিয় চিন্তাবিহীন ব্যক্তিরা সরল মানুষের চোখে ভাঁড় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে মাত্র, উহারা উদার মুক্তির স্বপ্ন জাগাইতে অক্ষম। বহুতর ইচ্ছা ও মত একীভূত হইয়া যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা উৎপন্ন হয় তাহাকেই এই কাজ করিতে হইবে।

আমাদের কালে কী আমূল পরিবর্তনই না সংঘটিত হইল! এই বিরক্তিকর কয় বৎসরে আমরা সর্বনাশের সংঘাত ও ভীতির অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি। আমরা হত্যাকারীর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছি—আমাদের দৃঢ় চরণ শৌর্যময় ভবিষ্যের দিকে চলমান। আমাদের ঐতিহ্যের মধ্যে যে রক্ষাকবচ আছে তাহা দারুণ দুঃখ ও ভয়ঙ্করকে দেখিয়া উপহাসের হাসি হাসে

আমাদের দুঃখের মধ্যেই চরম অপরাধীদের অপরাধের প্রত্যুত্তর আছে। আমাদের রাজনীতিকরা যখন দ্ব্যর্থক চিন্তার সমাধানে ব্যস্ত, তখন আমাদের শত্রুরা প্রচণ্ড হত্যালীলার আয়োজন করিতেছে। অতুলনীয় শোভামণ্ডিত অবিভক্ত ভারতবর্ষের প্রতিমূর্তি স্বল্পকালের মধ্যেই ভগ্ন ও মলিন হইয়া গেল। ভূমির সমগ্রতা ও স্বাধীনতার ধারণার মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। দুর্বৃত্তের দল আমাদের সম্পদ ও সম্মানের সূর্যালোককে আড়াল করিয়া দিয়াছে। তেজোদৃপ্ত বুদ্ধিমতী বালিকারা অপহৃত হইতেছে এবং বর্বরতার পরিবেশের মধ্যে জীবন যাপন করিতেছে। পাশবিক ক্ষুধার দাসেরা গৃহকে অপবিত্র এবং

নিরপরাধের দেহকে খণ্ড খণ্ড করিতেছে। বিবর্ণ নৈতিক ভাব ধ্বংসকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

চরম মনোবৃত্তিই রাজনীতির প্রাণ। ধর্ম্মান্ধতা হইতে অন্তরঙ্গতা, রক্তক্ষয়ী ইতিহাস হইতে আদর্শের সমন্বয়—এই দুই বিপরীত অবস্থার মধ্যে মানুষ প্রচণ্ড দোলা খায়। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের গোলযোগ এবং আত্মা-অপহরণকারীদের বিরাট প্রতিষ্ঠা আমাদের আদর্শকে ক্ষণস্থায়ী অন্ধকারে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। যখন শাস-করাই দুর্বৃত্তদের ভাল খাদ্য, পোষাক ও মারণাস্ত্র সরবরাহ করিতে থাকেন তখন মানব-জীবন একটি বিরাট দুঃস্বপ্ন হইয়া উঠে। অগাণত সাধারণ মানুষের অন্তরে ঘৃণার বীজ রহিয়াছে; ইতিহাসকে যাহারা পদে পদে বাধা দিতেছে বর্ত্তমান কালও তাহাদের সমর্থন করিতেছে।

এই হত্যালীলা এবং ধ্বংসের পরে শান্ত জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষা উদ্ভূত হইয়াছে। অবশ্য হীন প্রবৃত্তির এই ক্ষণিক আবরণ দ্বারা প্রেমমন্ত্রে দীক্ষা ও সৌভ্রাত্রের পুনরভ্যুত্থান নাও হইতে পারে। অত্যধিক রক্ত-পিপাসা ছিল বলিয়াই ইহার বিপরীত ধর্ম সদ্‌বুদ্ধির দিকে মানব সমাজ পরিচালিত হইতেছে।

ঐতিহ্যের বাহিরে গিয়া জনসাধারণ তাহাদের আদর্শকে খুঁজিয়া পাইবে না। গান্ধীজীর আত্ম-বলিদান তাহাদের মনকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়াছে—তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নূতন করিয়া চিন্তা করিতে সুরু করিয়াছে। সংকটই নব দৃষ্টিভঙ্গী, নূতন মানুষ সৃষ্টি করে। সম-সাময়িক গবেষকরা অন্যত্র বহু অনুসন্ধানের পর শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর পরিকল্পনাই গ্রহণ করিবেন। মহাত্মার প্রভাব ব্যয়িত হইয়া যায় নাই; তাঁহার চিন্তারাজি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও সুন্দর।

আমরা যদি ইহার প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করিতে না পারি, সেই তত্ত্বের সৌন্দর্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে। কারণ, একটি জাতির চিন্তাধারা যখন ক্রমবিকশিত হইতে থাকে তখন উহার মূল তত্ত্বগুলির নব নব অর্থ ও দীপ্তির প্রস্ফুরণ হওয়া উচিত। গান্ধীবাদ সমসাময়িক বোধকে

আত্মসাৎ ও অতিক্রম করিতে পারে। ইহা বাস্তবধর্মী, স্বাভাবিক, বিবর্তনশীল, দম্ভশূন্য এবং নিত্য নব বর্ণনার দীপ্তিতে ভাস্বর। গান্ধীবাদের বর্ণবিন্যাস সর্ব্বদাই বয়নযন্ত্রে রূপায়িত হইতেছে—উহা শিল্পকার্যে সমৃদ্ধ এবং মহত্ত্বের গুণে গরীয়ান। ঐ উদাত্ত শব্দের মধ্যে ভারতীয় সৌকুমার্য ও বোধ, উহার অন্তরেতিহাস এবং আকাঙ্ক্ষা রূপ পাইয়াছে।

গান্ধী-দর্শনেব কুয়াশাচ্ছন্ন প্রথম প্রত্যূষে বহু ঋষিকল্প ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত সংগ্রামীও আছেন। বর্তমান মনস্তাত্ত্বিক যুগের লোকদের প্রীত্যর্থে তাঁহাদের বিশ্বাসকে উজ্জ্বল রঙে রঙীন করিয়া তুলিতে হইবে। মহাত্মার সূক্ষ্ম মানসিক অনুভূতি, বিরাট্ সমগ্রতা ও পবিত্রতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া তাঁহার শিষ্যদের উচিত, একটি নূতন পরিকল্পনা লইয়া সত্যের সন্ধান চালাইয়া যাওয়া ; উহার নাম নব-গান্ধীবাদ।

প্রকৃত গান্ধী-আদর্শের সুরে আমরা যখন সঞ্জীবিত হই তখনই বিশ্বরহস্যের মূলকে আমরা স্পর্শ করিতে পারি। এই সময় আমাদের বর্ণগত পোষাক পরিত্যাগ করা, শক্তিকে রূপান্তরিত করা এবং অবিবাম প্রলোভনকে প্রতিহত করা একান্ত প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, গান্ধীবাদের অনুসরণকারীদের মধ্যে এমন অনেক অসাধু রাজনীতিক আসিয়া পড়িয়াছেন যাঁহারা নৈতিক হৃদয়াবেগ এবং পরগাছাবৃত্তিব অদ্ভুত যুগ্ম জীবন যাপন করিতেছেন। ইঁহারাই মুক্ত ভারতবর্ষেব আত্মা এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছেন।

বর্তমানে সভ্যতার উপর আক্রমণ চলিতেছে—এই সময় গান্ধী-বাদের সাবধান-বাণী ভারতবর্ষের বাহিরেও প্রচার করা কর্ত্তব্য। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জানা উচিত—যদি আবার অন্ধকার ঘিরিয়া আসে, তাহা হইলে মানস-প্রদীপ এবং গৃহদীপ দুইই নিভিয়া যাইবে। সুতরাং গান্ধীবাদকে সমর্থন করিলে পৃথিবীর বুকে সভ্যতার

শেষ চিহ্নকে রক্ষা করিবার প্রযত্ন করা যাইবে। এই বিশ্বাসের মধ্যে হাস্যময়ী প্রকৃতির আশ্বাস বর্ত্তমান; ইহা অরণ্যপথযাত্রী মানবের দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করিয়া দেয়। জীবনের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যকে যাহাতে না ভুলি তাহার জন্য আমাদের স্মৃতির মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে। আবেগকম্পিত হৃদয়ে আবার আমাদের সেই গম্ভীর ধ্বনি শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ইহা বিপর্যয়ের রক্ত-সংকেত সম্পর্কে আমাদের সাবধান করিয়া দেয়।

মানুষকে পুনরায় এই সত্য শিখিতে হইবে, যে কণ্ঠ কল্পনার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া বাণী উচ্চারণ করে, সমগ্র জগৎ বিপক্ষে যাইলেও উহা কখনও রুদ্ধ হয় না। ইহা জয়ের প্রতীক; ধর্ম-মন্দিরের শান্ত সত্য নয়, বেদনাদায়ক সত্যের রূপই উহার কাম্য। কখনও কখনও এই শিক্ষা যুক্তি এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকেও অতিক্রম করে। কিন্তু প্রেমের চিরন্তন প্রভাবকে ইহা সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকে।

নব-গান্ধীবাদ জীবনের একটি সমন্বিত ব্যাখ্যা। ইহার মতে প্রীতিই সকল প্রকার অস্তিত্বের মূলস্বরূপ। অন্তরের নিয়মানুবর্তিতা না থাকিলে স্থূল প্রবৃত্তিগুলিকে পবিত্রতা ও আনন্দে রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়। দলগত নৈতিক বোধ এবং যে গর্ব্বিত মতবাদ পূর্ণ ও সমন্বিত জীবনকে বিনষ্ট করে—ইহা তাহাদের বিরোধী। চিন্তাধারার মূল সূত্র—সত্যের সন্ধানের দ্বারাই মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। সত্যপথযাত্রীই ধ্রুব-নক্ষত্রে রূপান্তরিত হইতে পারে। মূল্য এবং দায়িত্ববোধ হ্রাস পাওয়াই মানুষ ও জাতির অধঃপতনের কারণ। সেইজন্য ইহা সমালোচনাকে একটি বিশেষ স্থান দেয়, জীবনের মধ্যে নূতন প্রাণশক্তির অনুসন্ধান করে, অন্তর্মুখীনতার গভীর নিয়ম-গুলি পালন করে, মানবীয় ও বাস্তব বোধকে জাগাইয়া তোলে এবং গান্ধীনীতির রক্ষা ও বিস্তারে যত্নবান্ হয়।

নব-গান্ধীবাদ জীবনের একটি নূতন আঙ্গিক রচনার চেষ্টা করিতেছে;

শিক্ষা, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্র, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সমাজ ও অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে উহা চিত্তের আনন্দকে প্রস্ফুটিত করিয়া তোলে। ইহা বৈপরীত্যের ঐক্যতান—শূন্যকুম্ভ বাদনের শব্দ নয়। নব-গান্ধীবাদীরা হইবেন অজ্ঞাতরাজ্যের নাবিক—প্রতি জন স্বীয় আদর্শ-বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এইরূপে তাঁহারা ভয়, বীভৎসতা, অনির্দ্দিষ্ট সম্ভাবনা ও মৃত্যুকে জয় করিবেন।

মনস্তাত্ত্বিকগণেব কিশোর-শিক্ষার নিয়মাবলী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও মানুষের স্বভাব বায়ু-স্রোতে ভাসমান বেলুনের মতই অনির্দ্দিষ্ট। নব-গান্ধীবাদ মানুষকে প্রীতির বিশ্বনৃত্যে যোগদান করিতে উদ্বুদ্ধ করে এবং এইভাবে আভ্যন্তরীণ সমতা ও সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা করে।

ইহার নয়নে বাস্তববুদ্ধি, ত্যাগ ও অন্তর্দৃষ্টি সমন্বিত নিখিল রাজ্যের স্বপ্ন, অন্তরে মানবজাতির সুদীর্ঘ শৈশব সমাপনের আশ্বাস। যখন মানব-জীবন নীতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তখন বিশ্ব-পরিকল্পনা উহার মানবীয় কেন্দ্রটি হারাইয়া ফেলে। নব-গান্ধীবাদ সমসাময়িক জীবনের যথাযথ চিত্রটিকে গ্রহণ করে এবং মানুষের বিকৃত ইচ্ছাব মর্ম বুঝিতে সক্ষম হয়। ইহা যুদ্ধ-ট্যাঙ্ক, যন্ত্র-সৈনিক ও বোমার ভীতি হইতে নৈতিক উল্লাস আহবণ করে এবং আত্মাকে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে।

প্রেমের অগ্নিশিখা চরম অত্যাচারকেও পরাভূত করে। ইহাই গান্ধীজীর পরম দান—ইহাকে বিস্মৃত হইলে মানুষ তাহার আত্মার বিপদ ডাকিয়া আনিবে। সুতরাং গান্ধীবাদই আমাদের চেতনাব সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি। কৌশলের দ্বারা কেহই আমাদের এই পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। ইহা রক্ষণশীল বিচার, অন্তঃসারহীন গর্ব এবং কালের নিষ্ঠুর আঘাতকে অতিক্রম করে। অতীত ও বর্তমানের সত্যকার ভারতবর্ষ সত্য ও প্রেমের মধুর মিলনের মধ্যে আপন নিয়তিকে অনুসরণ করে। ইহাই আমাদের একমাত্র চিন্তার বস্তু, একমাত্র রহস্য এবং অদ্বিতীয় পূর্ণ ধর্ম।

বর্তমানের দারুণ সংকটে এই কথাই আমাদের মনকে অধিকার করে যে, মানুষকে বাধ্য হইয়া দলগত সংকীর্ণ মতবাদের সহিত আপোষ করিতে হয়। মানুষ যে বিচারশূন্য হইয়া মেষের মত দলের নীতি অনুসরণ করে—ইহা আমাদের নিকট অতি পরিচিত। প্রত্যেক মানুষ আপন চেষ্টার দ্বারা নিজের মধ্যেই আদর্শলোক সৃজন করিতে পারে—এই বিশ্বাস নব-গান্ধীবাদকে সৃষ্টিধর্মী পরিপূর্ণতার দিকে লইয়া গিয়াছে। ইহা ব্যক্তিকে সমষ্টির আদর্শের প্রতি আকর্ষণ হইতে রক্ষা করে। ইহা সেই দিনের স্বপ্ন দেখে, যে দিন মানুষ তাহার কঠিন সমস্যাগুলি বিনা সাহায্যে সমাধান করিতে এবং জাতিগত বিশ্বাসঘাতকতা ও আন্তর্জ্জাতিক দস্যুতাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে।

জীবনের বাস্তব ভিত্তি সম্পর্কে আর একটি প্রশ্ন সর্বদাই উত্থিত হয়। নব-গান্ধীবাদ আমাদের অস্তিত্বকে দ্বন্দ্ব-তত্ত্বের বিকৃত দর্পণ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যায়। মূলতঃ আধ্যাত্মিক নিয়ম পালন করিলেও ইহা বস্তুর অনু-পরমাণুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ইহা একটি নূতন জীবন-দর্শন রচনা করে—উহার মধ্যে যন্ত্রযুগের স্বীকৃতি আছে, কিন্তু যান্ত্রিক মানুষকে মানসনেত্রে সকল জিনিষ দেখিতে হয়। বস্তুতঃ মরণশীল মানুষ বাস্তব জগতের নিরাপত্তাই কামনা করে। কিন্তু একান্ত করিয়া সর্বদা ইহাই আকাঙ্ক্ষা করা তাহার পক্ষে উচিত নয়।

শব্দগঠন প্রতিযোগিতা, পর্দা ও মঞ্চের আবেদন এবং রোমাঞ্চকর উপন্যাসের যুগে কোনো আদর্শবাদী আন্দোলনের পক্ষে সফলতা অর্জ্জন করা কি সম্ভব? তাহা ছাড়া ভগ্নপক্ষ বর্তমান সভ্যতার অন্তরে এখন শ্রান্তির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। আমাদের সন্দেহ হয়, অবনতি শুধু সমাজের মধ্যে আসে নাই, মানসিক অধঃপতনও ঘটিয়াছে। অলস মন, বাঁধাধরা নীতি, অন্তর্মুখীনতার অভাব এবং বিচারবিহীন সমাধানের মধ্যে নব-গান্ধীবাদ আধ্যাত্মিক শক্তি

প্রয়োগের সুযোগ দেখিতে পায়। যদিও নাসিকায় গলিত অতীতের দুর্গন্ধ আসিয়া লাগিতেছে তথাপি ইহা সমন্বয়কারী বিশ্বাসের ফুল্ল-কুসুমিত শোভা দেখিতে সমর্থ হয়।

নব-গান্ধীবাদ সুদীর্ঘ মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত জগতের প্রতীক-স্বরূপ। যদি এই আদর্শের অনুসরণকারীরা সত্যের অন্তরস্থিত আলোক দেখিতে পায় তাহা হইলে ভবিষ্যদ্বাণীর ডঙ্কা বাজাইয়া উহারা জাতিসমূহের অবনতি-পথযাত্রা রোধ করিতে সমর্থ হইবে। কেবলমাত্র তখনই তাহারা অহিংস এবং সীমান্তবিহীন জগতের অর্থ ও শোভা উপলব্ধি করিতে পারিবে। এই মুক্ত দৃষ্টি সংস্কৃতির উচ্চতর শিল্প ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকশিত হইয়া উঠিবে।

যদি এই বিশ্বাসের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত এবং ঐতিহাসিক ক্ষণের শক্তির দ্বারা পরিচালিত কোনো স্রষ্টা গান্ধীবাদের গভীরতম অর্থ উপলব্ধি করেন তবেই উহার নবজন্ম লাভ হইবে। তিনি গান্ধীজী-অনুসৃত সত্যের কষ্টিপাথরে মানুষের প্রধানতম সম্পর্কগুলি, তাহার স্বপ্ন এবং কামনাকে পরীক্ষা করিয়া লইবেন। এই বাস্তব নীতিবাদ প্রেমকে অনন্ত জ্ঞানের পরিবর্তে মানবীয় অভিজ্ঞতার প্রতি স্তরে প্রতিষ্ঠিত করিবে। তখন নৈতিক ইচ্ছা-শক্তি ঐতিহাসিক ইচ্ছা-শক্তিতে রূপান্তরিত হইবে। সেই জগতে সত্য ও প্রীতি, মোহমুক্ত আত্মা ও বাস্তবতার আলোক পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া যাইবে এবং একাগ্র অনুসন্ধানের দিকে ধাবিত হইবে।

যাহারা গান্ধী-প্রচারিত চিরন্তন সত্যে বিশ্বাসী—তাহাদের নিকট এই আধ্যাত্মিক বিপ্লবের নেতা আলোক-বর্তিকাস্বরূপ হইবেন। গভীর অনুভূতি, আত্মানুসন্ধান, সৌন্দর্যের সুষমা, প্রচণ্ড উত্তেজনা —ভারতবাসীর এই বিশিষ্ট প্রবৃত্তিগুলির নিকটই তাঁহার আবেদন। যাহাতে আমরা আণবিক ভীতিকে বর্জ্জন করিতে পারি তাহার জন্য তিনি আমাদের অন্তরকে সাহসের সঙ্গে গান্ধীমন্ত্র উচ্চারণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিবেন। আমাদের অন্তরের মধ্যে একটি জগৎ

আছে যাহাকে স্পর্শ করা যায় না—এই কথা তিনি ঘোষণা করিবেন। উহার সীমানার মধ্যে একটি মানবীয়তা জন্মলাভ করিতে ও বর্দ্ধিত হইতে পারে।

অস্পষ্ট ভীতি এবং ছায়াচ্ছন্ন জগতে বর্তমান পরিবেশ অতিক্রমকারী বিশ্বাস রচনা করা ক্রোধান্বিত বা মদগর্ব্বিত মনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সত্যের প্রয়োগ ঘটনাস্রোতকে পরিবর্তিত করিতে পারে। সেই নূতন নেতা এমন ব্যক্তি হইবেন যিনি সত্যের শক্তি বা 'সত্যাগ্রহে'র বৈশিষ্ট্যকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন।

ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের নাম স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। তাঁহার অকুণ্ঠিত বাস্তববোধ, মধুর শান্তপ্রকৃতি, পরিপূর্ণ সততা এবং সুসমঞ্জস মতবাদ খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতের নিকট আশ্বাসের বাণী বহন করিয়া আনে। রাজনীতির আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় তিনি আমাদের সম্মুখে মানবীয় মূল্য-বোধের পূর্ণ চিত্র উপস্থাপিত করিতে সক্ষম। তিনি পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য-রচনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন; তাঁহার প্রতিভা আমাদের নিবিড় ভাবে স্পর্শ করে। ভারতীয় ভাবধারার অন্তর্গত শ্রেষ্ঠ বস্তুগুলিকে সংহত করিয়া তিনিই এই দেশকে পাশবিকতার স্পর্শ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ। একমাত্র তিনিই গান্ধী-পরিকল্পিত আনন্দ ও শান্তির স্বর্ণরেণু আহরণ করিতে পারেন। সর্ব্বোপরি, বর্তমান কালের সংকট তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছে—তিনিই কণ্টকাকীর্ণ বিপদের লতা হইতে বিশ্বাস-কুসুম চয়ন করিতে সক্ষম।

—গান্ধী ইন্‌ষ্টিটিউট্—

স্মৃতিরক্ষার আতিশয্য আমাদের যুগের একটি অভিশাপ। যদি আমরা মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের মূল অনুসন্ধান না করি,—তাঁহার চিন্তাধারা ও জীবনদর্শনকে রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা অবিশ্বাসের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে।

ইহা স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন—এখনও গান্ধীজীই ভারতবর্ষ এবং তিনি যে আদর্শ ও মূল্য রাখিয়া গিয়াছেন উহা ব্যতীত আমাদের ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু নাই। এখন হইতে তাঁহার ঐতিহ্যের প্রাণসঞ্চারী বস্তুগুলিকে আমাদের সানন্দে বরণ করিয়া লওয়া উচিত।

এই পথে যাঁহারা চলিবেন তাঁহাদের দুইটি মূল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। গান্ধীজীর আদর্শের সংঘাত কি বহুধাবিভক্ত হইতে পারে? ইহার পক্ষে বিজ্ঞানের সূচীমুখ দ্বারা স্পৃষ্ট হওয়া কি সম্ভব? আমাদের আশা এই যে গান্ধী-অনুসৃত আদর্শ জগদ্ব্যাপী এবং উহার প্রক্রিয়া বাস্তবধর্মী। ইহাও আমরা নিশ্চিত জানি যে, যদিও ভবিষ্যৎ বিপদাকীর্ণ তথাপি গান্ধীজীর কথা স্মরণ করিলে মানুষ প্রকৃতিস্থ ও নিয়মানুগ জীবনের সৌন্দর্য দেখিতে সমর্থ হয়।

ভারতবর্ষের চোখে গান্ধী সর্বোপরি রুদ্র-সন্ন্যাসীরূপেই প্রতিভাত —তাঁহার রহস্যময় কণ্ঠ হইতে মুক্ত এবং সৃজনধর্মী বিশ্বজনীন ব্যবস্থার ভবিষ্যদ্বাণী নিঃসৃত হইতেছে। তাঁহার জীবন, আত্মবলিদান, বাণী, সর্বজাগতিক বৈশিষ্ট্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া গান্ধীয় গবেষণার বিষয় হইয়া থাকিবে। জাতীয় আত্মার জাগৃতি, জনগণ-মনের ইচ্ছা ও চরিত্র, সংস্কৃতির ঊর্ধ্বগামিতা এবং মানবের নৈতিক পুনরুজ্জীবন তাঁহার পরিকল্পনার গতি নির্দেশ করে।

গান্ধীয় বিপ্লবে যে নরনারীরা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা দেবলোকের অশরীরী অধিবাসী নহেন—তাঁহারা শুধু শ্যামল পৃথিবীকে ভালবাসেন এবং সদা-জাগরূক থাকিয়া নৈতিক আদর্শ পালন করেন।

গান্ধীজীর আত্মবলিদানের পরেই মানুষের ব্যাকুল দৃষ্টি তাঁহার কর্ম-কেন্দ্রিক নীতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে ; সেই নীতি আণবিক বোমা-সন্ত্রস্ত জগতের সম্মুখে আশার পান-পাত্র তুলিয়া ধরিতে সক্ষম। মানবীয় কাহিনীর উপর অন্ধকারময় যবনিকা নামিয়া আসিবার আগেই, মানুষের সম্মান ও সৃজনক্ষমতার উপর যান্ত্রিক শক্তি আঘাত হানিবার পূর্বে গান্ধীজীর অন্তরের স্বপ্নকে নিখিলব্যাপী রূপ দিতেই হইবে।

গান্ধী-দর্শনের মূল উহার বিশ্বজনীন সারবস্তু ও গঠন। এখনও পর্যন্ত ইহার প্রয়োগ জাতীয় প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের মনে হয় ঐক্যবদ্ধ, বক্তিত্ববোধক, অহিংস বিশ্ব-বিধান রচনার গুরু দায়িত্ব নব-গান্ধীবাদের উপরই ন্যস্ত হইয়াছে। নব-গান্ধীবাদী জগতের বিভিন্ন প্রভাবের ন্যায্য গবেষণায়, প্রকৃতি ও জীবনের পরম সামঞ্জস্যে এবং ঐতিহ্য ও নব-পরিকল্পনার মিলনে বিশ্বাস করে। শাসনকর্তারা আজ মানুষকে বিস্মৃত হইয়াছেন,—সাধারণ মানুষও আর উহার নব নব ছদ্মবেশে ও মনোমুগ্ধকর বাক্যে ভুলিবে না। অতএব যাহারা নবসৃষ্ট দুঃখ-যন্ত্রণার ভারে প্রপীড়িত তাহাদের গান্ধী-আদর্শ গ্রহণের সুযোগ দিবার জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক আন্দোলনের প্রচেষ্টা কেবলমাত্র খেয়াল চরিতার্থ করা নয়।

নূতন ধারণাসমূহ না থাকিলে আমরা কেমন করিয়া নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করিব? আমরা একটি আদর্শকে বহুতর কোণ হইতে দেখিতে পারি না বলিয়া বীর্যবান্ মুক্ত ভারতের কাকলি সহজেই উপহাসের বস্তু হইয়া উঠে। আমাদের প্রধান কর্তব্য—নূতন পরিস্থিতির গভীরতাকে হৃদয়ঙ্গম করা এবং বৈপ্লবিক আশাবাদের পুনর্গঠনে সাহায্য করা। জনসমাজের গতি-শক্তি এবং সাধারণ নীতির আত্মবিচার ও অন্তর্মুখীনতার মধ্যে সামঞ্জস্যের স্বীকৃতি—ইহার উপরই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তি রচনা করিতে হইবে। বাহ্যিক রূপ দেখিয়া ইহাকে ধর্মহীনতা মনে হইতে পারে কিন্তু

বস্তুতঃ ইহা প্রচলিত ধর্মকে সংকীর্ণ ও বিষাক্ত পথ হইতে সূক্ষ্ম উপায়ে ভিন্ন মার্গে পরিচালিত করিবে।

বর্তমানে ভারতবর্ষের প্রধান চিন্তাধারা মূলতঃ গান্ধীয়, কিন্তু উহার সহিত নৈতিক ও সামাজিক নিয়মানুবর্তিতা মানুষের মনের গভীরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। চিন্তা ও কর্মের মধ্যে এই ব্যবধান গান্ধীবাদকে আমাদের ইতিহাসগত জীবনধারা হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইতেছে।

জীবনের সহিত চিন্তাকে সমন্বিত না করিতে পারিলে সমাজের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা অর্থহীন হইয়া পড়ে। এই নূতন বোধের বিন্যাস গান্ধী-অনুসৃত ও প্রচারিত সুদৃঢ় অথচ সরল সত্যের মধ্যে খুঁজিতে হইবে। জীবনের সত্যগুলি যদি শুধু আমাদের মনের মধ্যেই থাকিয়া যায় তাহা হইলে উহারা নিজ্জীব হইয়া পড়ে। উহার কর্তব্য আত্মার সৃজনশক্তির উপর আস্থাকে সুদৃঢ় করা। একমাত্র তখনই জীবন মূল্যের রসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। মানুষ নূতন নির্দ্দেশের সূর্যালোকিত পথে যাত্রা সুরু করে।

বর্তমান দুর্দ্দশার মূলে যান্ত্রিক নিয়তির প্রলোভন বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সমাজে মানবিক সম্পর্ক বাহ্যিক হইয়া উঠিয়াছে—মানুষ কতকগুলি প্রবৃত্তির সমষ্টিতে পরিণত হইয়াছে। অমানুষ সমাজের উপরিভাগে শুধু লোকমতের একটি সূক্ষ্ম আস্তরণ রহিয়াছে মাত্র। প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ছল ব্যতীত আর কিছুই নহে। সৃজনের কঠিন ভিত্তি না থাকায় বিচ্ছেদ এবং অসঙ্গতির বোধ ক্রমশঃই বাড়িতেছে। যখন আমরা বলি গান্ধীর জীবনাদর্শ নব অস্তিত্বের কেন্দ্রস্বরূপ—ইহাকে কোনোমতেই অতিশয়োক্তি বলা যাইতে পারে না। ইহা জগতের নিকট প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তি ধ্বংসের কারণ। যে সব নীতি উচ্চতর অনুভূতিকে রুদ্ধ করিয়া দেয় তাহাদেরই বিরুদ্ধে ইহার যুদ্ধ-ঘোষণা।

গান্ধী ইনষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য—মহাত্মার দর্শন ও প্রয়োগকৌশলের

ভিত্তিতে রচিত বিশ্বজীবনের নূতন ছন্দের প্রয়োজন ও সম্ভাবনাকে যাঁহারা স্বীকার করেন সেই সকল উৎসাহী ব্যক্তি ও সমাজসংস্কার-প্রচারকদের একত্র করা। ইহার জন্য গান্ধীয় ভাবধারার নূতন করিয়া মূল্য নিরূপণ এবং সভ্যতার বিভিন্ন দিকের পুনর্গঠন প্রয়োজন। স্বচ্ছতা, শুচিতা ও মানবীয় অনুভূতি এই নব আন্দোলনকে শক্তি ও বিস্তৃতি দান করিবে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সত্যানুসন্ধানীদের একটি ক্ষুদ্র দল মহান্ আধ্যাত্মিক কর্মের অগ্রদূত হইতে পারে। নব-গান্ধীবাদে এই উৎসাহ কেবলমাত্র বর্তমান যুগের ছদ্মবেশ-পরিহার নয়—ইহা জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত করার প্রচেষ্টা। অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য ইহা মানবপ্রকৃতির ধাতুকে কঠিনতর করিয়া তোলে। অনুসন্ধানের স্পৃহা যতই বাড়িবে ততই ইহার কাজ ভাল হইবে। তখন এই আদর্শ গোপন চিন্তা, তীব্র সন্দেহ এবং প্রচণ্ড ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে অশ্রু ও রক্ত দিয়া সংগ্রাম করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইবে না। গান্ধীর আদর্শ যদি প্রকৃতির ঐশ্বর্য, শক্তি ও বাস্তবতা লাভ করে, নব-গান্ধীবাদ সাগরপারেও জনপ্রিয় হইতে পারিবে। বিশ্বমুক্তি ও গৌরবের প্রথম প্রভাতকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও আত্মপরিতুষ্ট মানুষ বরণ করিয়া লইতে পারে না। সংকীর্ণ বাস্তববুদ্ধি প্রণোদিত রাজনীতিক নিজেকে সম্পূর্ণরূপে জানে না—অতএব জগৎকে জানিতেও অক্ষম। যাহারা বিলম্বিত চিন্তা ও রুগ্ন উত্তেজনার পরিবর্তে মহৎ মৃত্যুবরণকে কামনা করে তাহারাই নব অত্যাচারীর বজ্র-আলিঙ্গন হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে সমর্থ। অনুসন্ধানের দ্বারা তাহারা সত্য সঞ্চয় করিবে এবং সত্য লাভ করিয়া আরও বিনীত হইবে। একমাত্র তখনই তাহারা তাহাদের অগ্নিময়ী বাণী চীনদেশের কুটীরদ্বারে, তিক্ত-মধুর গোবি মরুদ্যানে, মনোহর ফরাসী শিল্প-ভবনে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে। এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 'গান্ধী ইনষ্টিটিউট্' নিম্নলিখিত কার্যসূচী গ্রহণ করিয়াছে।

১। ইহার প্রথম কাজ—গান্ধীজীর মতবাদ ও নীতির সরল

ব্যাখ্যা দিবার জন্য গ্রন্থমালা প্রচার করা। উহার মধ্যে গুরুগম্ভীর বাক্যবিন্যাস ও উপদেশ এবং বিষয়বস্তুকে অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা থাকিবে না।

এই ব্যাখ্যা জনপ্রিয় অথবা তাত্ত্বিক রূপ গ্রহণ করিবে—ইহাই মূল সমস্যা। গুরুগম্ভীর তত্ত্বের স্তরের অর্থ বাহ্যিক ঔজ্জ্বল্য, অর্থহীন উক্তি ও প্রাচীনত্বের পরিবেশ। আবার শুধু জনপ্রিয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে আদর্শটি উত্তেজক ঔষধ বা আষাঢ়ে গল্পে রূপান্তরিত হয়। যদি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি অস্পষ্টতার পরিবর্ত্তে স্বাভাবিকতার যাদু-মন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হ'ন তাহা হইলে তাঁহার সম্মানহানি ঘটে না। এই সত্যটী উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। তা ছাড়া, গান্ধী-আদর্শ জনগণমনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। যে যুগে প্রতি বৎসর ৫০০০ উপন্যাস প্রকাশিত হয়, সে যুগে প্রাণবন্ত ক্ষণকে দেখিবার ও উহাকে অমরত্ব দান করিবার শক্তি এক পরম দান। অতএব পুস্তক খুবই অল্পমূল্য ও বহুপ্রচারিত হওয়া প্রয়োজন—উহাতে এক বিশেষ প্রকার মনোহারিত্ব ও গরিমা না থাকিলে চলিবে না।

বুদ্ধিগত ব্যভিচারই সাহিত্যের প্রকৃত বিপদ। গান্ধীর নাম লইয়া যে কোন অন্তঃসারশূন্য পুস্তকই প্রকাশিত হউক, আমাদের দেশের জনসাধারণ তাহা বিনা দ্বিধায় গলাধঃকরণ করিবে। যে কল্পনা-প্রবণ লেখকরা বিশ্বাস করেন যে, দুর্বল মনের চাহিদা মিটাইবার প্রচেষ্টার দ্বারা শিল্প-সৃষ্টি সম্ভব নয় তাঁহারাই এই দুশ্চিন্তা দূর করিতে পারেন। তাঁহারা চিন্তা ও অনুভূতির পরস্পর-অতিক্রমী বিচিত্র তরঙ্গের মধ্যে প্রগতির মূল সূত্রটি দেখিতে পান। ইহার জন্য নিমানুবর্ত্তী বুদ্ধির প্রয়োজন—হস্তীদন্ত-মিনারের স্বপ্নবিলাস নয়।

২। গান্ধীজীর চিন্তাধারার মনোমুগ্ধকর বৈশিষ্ট্য—ইহা মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনের সঙ্গে সামাজিক গবেষণাকে সংযুক্ত করিয়া জয়যুক্ত করিয়াছে। যদি সমাজবিজ্ঞানীরা এই সার তত্ত্বগুলির ভিত্তিতে রচিত জীবনের নূতন পরিকল্পনা দান করেন তাহা হইলে

গান্ধীজীর প্রয়োগকৌশল সামাজিক দুর্নীতি, নৈতিক অবসাদ ও জাতীয় স্বার্থপরতার সংস্কার করিতে সমর্থ হইবে। অগণিত পরীক্ষা-মূলক বিজ্ঞানাগার, সংস্কৃতি-ভবন, শিশু-পালনাগার ও কল্যাণকর্ম-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। গান্ধীয় সমাজ-তত্ত্ব ও ফলিত মনস্তত্ত্ব গড়িয়া তুলিতে হইবে।

ঘটনাস্রোত হইতে এই তিক্ত শিক্ষা লাভ করা যায় যে, মানুষ নব-গান্ধীবাদ অভিমুখে শম্বুকগতিতে অগ্রসর হইবে। অলস গণমনে চেতনা জাগ্রত করিবার কৌশল এখনও আমরা আয়ত্ত করিতে পারি নাই বলিয়া আশার চিহ্ন আবিষ্কার করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান যুগে অর্থগৃধ্নুতা আদর্শবাদীকেও গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। এমন কি ইহাও বলা যাইতে পারে যে শিল্পানুভূতি বিস্তারের প্রচেষ্টাকে বর্জ্জন করা হইয়াছে। আজ রুচির প্রতি ক্ষেত্রে আদর্শ-বাদীরা তথাকথিত প্রথম-পুরস্কার-বিজয়ীদের কথাই আলোচনা করিয়া থাকে। মানুষের মুক্ত আত্মা অসাধুতা ও একাগ্রতার সংমিশ্রনের তলায় চাপা পড়িয়াছে।

জীবন হইতে ভীষণতা ও বিকৃতি দূর করিয়া সৌন্দর্য ও স্বাভাবিক ছন্দকে প্রতিষ্ঠিত করিবার নূতন উপায় আমাদের আবিষ্কার করিতে হইবে। প্রীতি ও সত্যের নিবিড় সামঞ্জস্যের দিকে আবার ফিরিয়া আসা একান্ত প্রয়োজন। আজ মানুষ বিকৃত দৃষ্টি লইয়া জীবনের দিকে তাকাইতেছে। মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে অধিকাংশই খুব উৎসাহের সঙ্গে প্রতীকবাদ লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন। এখন তাঁহাদের নিবিড়ভাবে মন দেওয়া উচিত নৈতিক সমন্বয়ের দিকে। গান্ধীবাদের প্রতীকগুলি সমৃদ্ধতর হইয়া মানুষের নিকট নির্দ্দিষ্ট বাণী আনিয়া দিয়াছে।

৩। গান্ধীজী জীবনের মূল্য প্রতিষ্ঠাকল্পে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন—এই যুদ্ধের মধ্যে ক্ষমাও বিদ্যমান। তিনি জীবনকে অস্বীকার করেন নাই, উহাকে উজ্জ্বলতা দান করিয়াছেন। জনগণের অন্তরে

শৌর্য ও বিশ্বাস জাগ্রত রাখিবার জন্য নূতন প্রচারভঙ্গী আবিষ্কার করা প্রয়োজন। শ্লোগান, প্রতীক ও শব্দের শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাইতে হইবে। গান্ধী-আদর্শে অনুপ্রাণিত বেতার, ঐক্যতান, যাদুঘর, পৃথিবীব সর্বভাষায় পত্রিকাদি, আলঙ্কারিক শিল্প, খেল্‌না, বয়ন, প্রাচীর-চিত্র, নৃত্যনাট্য ও অভিনয় বিশ্ববোধকে গভীরতর করিতে পারিবে।

বর্তমান কালের অভিনয়-কলার মধ্যে উৎসাহের একান্ত অভাব। গান্ধীয় তত্ত্বকে অভিনয়ের উপযোগী করিয়া তোলা সত্যই সাহসের কাজ। মুদ্রিত নাটকের নীতির ভাব ও সত্যের সুরে কল্পনার প্রভাব থাকা প্রয়োজন। সেই গভীর আদর্শবোধ ও উচ্ছ্বসিত আনন্দকে অভিনয়ের মধ্যে রূপায়িত করা কঠিন। একটি তত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়া এমন নাটক রচনা করা যাইতে পারে যাহার মধ্যে প্রধান আবেদনগুলি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ইহা জীবনের হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যারূপে গৃহীত হইতে পারে।

গান্ধীযুগে সংগীত ও কাব্য একটি তরুতে কুসুমিত হইয়া উঠিবে। ভক্তিমূলক শিল্পসৃষ্টিতে মহাত্মাব অবিচলিত বিশ্বাস ছিল—তিনি প্রার্থনার সাহায্যে মূল সত্যগুলির আরাধনা করিতেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতি নিষ্ঠা তাঁহাকে আত্মবিসর্জ্জনের পথে টানিয়া লইয়া গেল। যে সুন্দর ও সতেজ ভক্তিমূলক শ্লোক সুপ্ত প্রবৃত্তিকে নূতন নির্দ্দেশ দিতে পারে, যাহা বাক্য ও সুরের সমন্বয় সাধন করে—তাহা আধ্যাত্মিক নৈরাশ্যকে দূর করিতে সক্ষম। উহা মানুষকে আপন রক্তদানে সত্যের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন করিতে উদ্বুদ্ধ করিবে। গান্ধীয় ঐক্যতান নূতন সমন্বয়-সম্পদকে আবিষ্কার করিবে, নীতিশ্লোককে সংগীতের ছন্দ ও সুরে গাঁথিয়া দিবে।

ভারতীয় প্রতিভা সমন্বয়ধর্মী, মানবীয়,—উহা অর্থপূর্ণ প্রতীক ও ছন্দময় বোধে আনন্দ অনুভব করে। জীবনের অংশগুলি ইহার বিরাট ক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছে। গান্ধীয় ঐক্যতানের লক্ষ্য কেবল-মাত্র শ্রান্তিকর মাধুর্য নয়,—ধ্বনি-সংমিশ্রন ও গতি তাহার কাম্য।

গান্ধীয় সংরক্ষণশালা গভীর ধর্মবোধকে জাগ্রত করিবে। প্রতি প্রদর্শিত দ্রব্যের মধ্যে গান্ধী-আদর্শের স্পর্শ থাকিবে এবং উহা দেহজ বোধকে অতিক্রম করিবে। রেখার প্রকাশ, মর্মরমূর্তির অলঙ্কার ও দৃশ্যপট, এবং চিত্রণ গান্ধীজীর চিন্তাধারার সুন্দরতম দিকগুলিকে উদ্‌ঘাটিত করিবে। আলোকের বিন্যাস জীবনের পরম আনন্দ, রহস্য ও গতিকে ফুটাইয়া তুলিবে।

নৃত্য-নাট্য জাতির সাংস্কৃতিক গঠনকে প্রকাশ করে। বিভিন্ন শক্তির নব জাগরণ প্রত্যেক শিল্পীর নিকট এই দাবী করে যে, তিনি তাঁহার বিষয়বস্তুকে রূপান্তরিত করিতে সক্ষম হইবেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আমাদের নৃত্যনাট্যকলা ঘটনার দ্রুত গতির সহিত তাল রাখিতে পারে নাই। ইহার কারণ কল্পনা ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে সৃজনধর্মী স্বাধীনতার প্রতি আমাদের শিল্পীদের বিশেষ আস্থা নাই। ইহা বিরুদ্ধ সমালোচনা নয়—সুন্দরের সাধনায় জয়লাভের নির্দ্দেশ মাত্র। কেবলমাত্র মুক্ত শিল্পদৃষ্টিই প্রতি পদক্ষেপ, প্রতি ভঙ্গীটিকে কল্পনার শক্তি ও স্বতঃস্ফূর্তি দান করিতে পাবে। যদি আমরা বলি আজ আঙ্গিকের যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া কাহিনীমূলক গীতিনাট্য গ্রহণ করা কর্তব্য, তাহা হইলে শিল্পীরা ঘোর আপত্তি তুলিবেন। নৃত্যশিল্পীকে তাঁহার সংকীর্ণ গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইবে, তাঁহার ভঙ্গীগুলির মধ্যে সহজবোধ্য শিল্পগত অর্থ থাকা প্রয়োজন। তিনি যতই সত্যের নিকটে আসিবেন তাঁহার শিল্পসৃষ্টির আবেদন ততই বিরাট ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে। ঐক্যবোধের দুর্গকে সুদৃঢ় করিতে হইলে আরও সম্প্রদায়গত ও লোকনৃত্য প্রচলনের প্রয়োজন। বিচিত্র নৃত্য ও নাট্যের মধ্যে গান্ধীজীর প্রিয় বিষয়গুলির অবতারণা করিলে নৈতিক বোধের গতি ও গরিমার পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইহা কাব্য, সংগীত ও দৃশ্যনাট্যের সুষমার একটি উজ্জ্বল সমন্বিত রূপ হইবে।

৪। নব-গান্ধীবাদী নূতন নেতার নেতৃত্বে অগ্রসর হইয়া যাইবে।

গান্ধীজীর মূল্য বিচারের আলোকে বর্তমানের বিরাট্‌ সমস্যাগুলি তরুণদের দেখিতে শিখাইবার জন্য বিত্তায়তন, নেতৃত্ব ও মানবিকতার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

৫। নীতিবাদীরা যান্ত্রিক ও অভিশপ্ত জগতের রূপকে কিছুমাত্রায় বেশি কালো করিয়া চিত্রিত করেন। কিন্তু তাঁহারা বিশ্বের নৈতিক বিধানের চরম আভাষও দান করিয়া থাকেন। দুঃখের ছায়াতলে দাঁড়াইয়াও গান্ধীজী তাঁহার উক্তিগুলির মধ্যে সুষমা, আশার আলোক, উজ্জ্বল শক্তি ও উচ্ছল প্রাণময়তা প্রকাশ করিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ সাহসী একনিষ্ঠ সেবক যাহাতে এক নৈতিক নিয়মে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে তাহার জন্য বিদ্বজ্জনসমাগম, গবেষণা বৃত্তি ও গান্ধী-দর্শনের অধ্যাপকপদ প্রতিষ্ঠা উপযুক্ত উপায়।

গান্ধীবাদীদের সম্মেলন চাতুরীও নয় বা অবশ্যকর্তব্য ব্যাপারও নয়। ইহার মধ্যে চণ্ডভাব বা আত্মপ্রবঞ্চনার চিহ্ন থাকিবে না। মানুষ ইহার সাহায্যে নূতন নৈতিক নিয়তিকে অভ্যর্থনা করিতে শিখিবে। ইহা অসঙ্গতি দূর করিয়া সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিবে। এইরূপে নবনির্দ্দিষ্ট মূল্য সর্বত্রগ্রামী হইবে। আমরা গান্ধীজীব সংগ্রামময় জীবন হইতে দুইটি সত্য লাভ করি :—কালধর্মী জগতে মানুষ পূর্ণতা অর্জ্জন করিতে সক্ষম; সৃজনমুখী ব্যক্তিত্ব মুক্তি ও অনন্ত পথযাত্রার পাথেয়। ইহাই নীতিগত নির্ভর, ইতিহাসের জয়কেতন।

গান্ধীজীর জীবন-কাহিনীর মধ্যে একটি বেদনার সুর বর্তমান। অবশ্য এমন অংশও আছে যাহা গোলাপের সুগন্ধে পরিপূর্ণ। গভীরতর অনুভূতি দ্বারা অনুপ্রাণিত বাণীগুলি নিখুঁত রত্নবিশেষ। তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত রসবোধ ও রহস্যময় দৃষ্টির বুদ্ধিগত বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয়। তাঁহার নীতিগত বাস্তববোধ পূর্ণ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার নির্ভীক প্রয়াস। ইহা জীবনকে একটি আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া রূপে কল্পনা করে। নিবিড় প্রীতিবোধ উহার ভিত্তি ও প্রেরণা। এই স্তরে গান্ধীবাদের

প্রয়োগক্ষেত্র সমগ্র বিশ্ব—ইহা জাগতিক বিপ্লবের মূলসূত্র, প্রাণশক্তি।

৬। আত্ম-বলিদানের কয়েক মাস পূর্বে গান্ধীজীর উপর ভগ্ন আশার ছায়াপাত হইল। তিনি অনুভব করিলেন, তাঁহার শিষ্যরা নীরব সংগঠন-কর্মের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। গান্ধী ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ ইহা বিশ্বাস করে যে যদি তলদেশ হইতে উপরের দিকে নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া না উঠে তবে গান্ধী-প্রচারিত পরম সত্যগুলি পটভূমির অন্তরালে হারাইয়া যাইবে। সামাজিক ত্রুটির সংস্কার, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, মূল মজুরী, আত্ম-পরিপূর্ণতা, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক শিক্ষা, সমবায়-দৃষ্টি ও সমন্বিত জীবনযাত্রা—এইগুলিই অগ্রগতির আশা। গণ-সংযোগ ও গণ-সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলি নব কৃষি-আন্দোলনের প্রাণ-স্বরূপ হইবে। অনুন্নত গ্রামগুলি আমাদের আমূল পরিবর্তন প্রচেষ্টার দুর্বলতার সাক্ষ্য দিবে।

৭। গান্ধীবাদ একটি সাম্যপ্রতিষ্ঠাকারী প্রক্রিয়া। জাতিভেদের দাসত্বকে চূর্ণ করিয়া ইহা আমাদের হারানো জীবন-মন্ত্রকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানে সত্যের আদর্শকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করিতে হইবে এবং ইহা জাতীয় রক্তধারায় মিশিয়া যাইবে।

৮। মানবপ্রকৃতির একটি অদ্ভুত অক্ষমতা আছে—সামাজিক মানের খাতিরে আমরা আত্মাকে খর্ব করি। এ কারণে অনেকে গোপনে বিফল অশ্রু বিসর্জ্জন এবং তীব্র বেদনা অনুভব করিয়াছেন। গান্ধীবাদ অনুদার লোকমতের ভিত্তিকে শিথিল করিয়া দিয়াছে, লক্ষ লক্ষ নারীকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিয়া তুলিতে সক্ষম করিয়াছে। এই বিশ্বাসের যাদুমন্ত্রের সাহায্যে নারী অসহায় ভীতি ও পরম ক্ষতি হইতে মুক্ত হইয়াছে। ইহা নারীর কোমল হৃদয়কেই শুধু বড় করিয়া দেখে নাই—জোরের সহিত বলিয়াছে, নৈতিক মুক্তি ও আত্মবিশ্বাস নারীর অন্তর হইতেই ফুটিয়া উঠিবে।

গান্ধী ইন্‌ষ্টিটিউটের মতে মুক্ত জীবন-সংগঠনের প্রতিযোগিতায় নারী জয়লাভ করিয়াছে; তাঁহাদের উচিত এই গৌরবকে সযত্নে রক্ষা করা।

গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের মত তাঁহার আদর্শের বিরাট ছন্দও সর্বদা আমাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। তবুও ইহার মধ্যে প্রচুর সূর্যালোকে উদ্‌ভাসিত জীবনের আশ্বাস আছে। গান্ধী ইন্‌ষ্টিটিউট এই বিশ্বাসের মশাল নিরবচ্ছিন্ন সত্যানুসন্ধানকারীদলের হাতে দিয়া যাইবে।



—পরিকল্পনা—

গান্ধী ইন্‌ষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য—মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক অভিব্যক্ত নৈতিক দর্শন ও সভ্যতার বিভিন্ন সংস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা এবং উহার প্রসার ও পূর্ণ পরিণতির জন্য সচেষ্ট হওয়া।

গান্ধীবাদ শিক্ষায়তন

উদ্দেশ্য ঃ—গান্ধীজীর মূল শিক্ষার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জাগ্রত করা। প্রীতি ও সত্যের মধ্যে জীবনকে প্রস্ফুটিত করিবার উপযোগী পরিবেশ রচনা করা; একটি সত্যসন্ধ দলকে আদর্শের সঠিক প্রকাশ উপলব্ধি ও বাস্তবের সংস্কার সাধন করিতে শিক্ষা দেওয়া।

এক বৎসরের স্নাতকোত্তর পাঠ ঃ উপাধি

ব্যাচিলর অব্ গান্ধীজম্; স্নাতকরা গবেষণাগার ও কৃষ্টিকেন্দ্রে গান্ধীয় জীবন-দর্শন শিক্ষা দিবেন।

শিক্ষকগণ ঃ

১০	অধ্যাপক	১,৫০,০০০
২০	অবৈতনিক অধ্যাপক	৫০,০০০
৫	শিক্ষক	৩০,০০০
	কেরাণীগণ	১৫,০০০
		২,৪৫,০০০

মাসিক ৩০৲ হারে ১৫০০ ছাত্রের বেতন

৪৫,০০০ × ৮ মাস ৩,৬০,০০০

স্থায়ী সম্পত্তি

বিদ্যালয়-গৃহ	১০,০০,০০০
ছাত্রাবাস	৫,০০,০০০
পাঠাগার	৫,০০,০০০
	২০,০০,০০০

(আরম্ভ হইতেই বাৎসরিক ১,১৫,০০০ টাকার অধিক লাভ হয়)

দ্রষ্টব্য :—পাঁচ বৎসরে ইহার ৫০০০ স্নাতক কর্তৃক প্রায় ৫,০০,০০,০০০ ব্যক্তি দীক্ষিত হইবে।

নেতৃত্ব শিক্ষায়তন

উদ্দেশ্য :—বিশেষ পটভূমিতে যে যুক্তিসঙ্গত নিয়মানুবর্তিতা উহার কল্পনাকে প্রতিযোজন করিয়া লয়—তরুণ মনে তাহাই জাগ্রত করা; বিচিত্র প্রবৃত্তি ও লক্ষ্যের আদর্শকে উপলব্ধি করা; নূতন যুগের আইনকার, রাজনীতিবিদ্, সংস্কৃতি-প্রচারক, ট্রেড-কমিশনার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকারীদের শিক্ষিত করিয়া তোলা; নব-গান্ধীবাদী বা বিশ্বমানবকে সৃজন করা।

দুই বৎসরের স্নাতকোত্তর পাঠ : উপাধি : গ্রাজুয়েট অব্ লীডারশিপ্।

শিক্ষকগণ :

১০	অধ্যাপক	১,৫০,০০০
২০	অবৈতনিক অধ্যাপক	৫০,০০০
৫	শিক্ষক	৩০,০০০
	কেরাণী	৩০,০০০
		২,৬০,০০০

মাসিক বেতন ২০৲

১৬০ × ২০০০ ছাত্র	৩,২০,০০০৲

স্থায়ী সম্পত্তি

বিদ্যালয়-গৃহ	১৫,০০,০০০
ছাত্রাবাস	৮,০০,০০০
স্টেডিয়াম	৫,০০,০০০
পাঠাগার	৫,০০,০০০
	৩৩,০০,০০০

(বাৎসরিক আয়—৬ ,০০০৲)

এশিয়ার মধ্যে ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান হওয়ায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ছাত্রদের ইহাতে যোগ দিতে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

সমাজ-সেবা শিক্ষায়তন

উদ্দেশ্য ঃ—সামাজিক গতি ও পরিবেশ সম্পর্কে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি লাভ ও উহাব উপর প্রভাব বিস্তার করা; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মূল্য ও স্থান নির্ণয় করা; মানবীয় প্রবৃত্তিগুলিকে যুক্তি-অনুগামী করা; মনোরোগ-চিকিৎসাবিজ্ঞান, সমাজসেবা-সংগঠন, সমাজ পরিকল্পনা ও ফলিত সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করা।

ইণ্টারমিডিয়েটের পর ৩ বৎসরের পাঠ

বেতন ১৫৲; ছাত্রীদের কোনো বেতন নাই।

৫০০ ছাত্র ও ২০০ ছাত্রী

আয় ১২০ × ৫০০ = ৬০,০০০৲

শিক্ষকগণ ঃ

৮	অধ্যাপক	৬০,০০০৲
৪	শিক্ষক ও পরীক্ষা-প্রদর্শক	২৫,০০০৲
	কেরাণীগণ	২০,০০০
		১,০৫,০০০

স্থায়ী সম্পত্তি

বিদ্যালয়-গৃহ	৮,০০,০০০
পাঠাগার ও পরীক্ষাগার	৫,০০,০০০
আদর্শ কেন্দ্র	১,০০,০০০
ছাত্রাবাস	৫,০০,০০০
	১৯,০০,০০০

(বাৎসরিক ১ লক্ষ টাকা সরকারী সাহায্য প্রয়োজন)

মনোচিকিৎসার পরীক্ষাগার ও সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত পাঠাগার

উদ্দেশ্য : সমগ্র সমন্বয়ের জন্য প্রত্যেক প্রবৃত্তিকে আপন পূর্ণতা দানে সক্ষম করা।

পরীক্ষাগার, প্রয়োগ-কেন্দ্র ও পরামর্শ-গৃহ :

৪	মনোচিকিৎসক	৫০,০০০
২	পরীক্ষা-প্রদর্শক	৫,০০০
১	পাঠাগার-পরিচালক	৬,০০০
	কেরাণীগণ	১০,০০০
		৭১,০০০

গৃহ, পরীক্ষাগার ও পাঠাগার—১০,০০,০০০ (বাৎসরিক ৭১,০০০৲ সরকারী সাহায্য প্রয়োজন)

গান্ধী শান্তি বেতার-কেন্দ্র

উদ্দেশ্য : জগতের অন্ধ ও মানব-বিরুদ্ধ শক্তিগুলিকে নীতি-কেন্দ্রিক করিয়া তোলা ; নীতিগত মানসিক উত্তেজনা জাগ্রত করিয়া যুদ্ধ-প্রবৃত্তিকে প্রতিরোধ করা।

চিন্তাশীল নেতাদের বাণী সারা জগতে প্রচার করিবার জন্য সংবাদদাতা-দলের ব্যবস্থা ; সংগীত, নাটিকা, প্রবন্ধমালা রচনা ; শান্তিবাদী দৃষ্টিকোণ হইতে জগতের ঘটনাবলীর সমালোচনা ; গান্ধীজীর দর্শন, প্রয়োগ-কৌশল, প্রচণ্ড প্রেমের প্রতীক-নাট্য সৃষ্টি।

বেতার বার্তাপ্রেরণ, কেন্দ্রাধ্যক্ষ, ঘোষক, সম্পাদক, শিল্পী, ঐক্যতান, সংবাদদাতা প্রভৃতি ১০,০০,০০০

(বাৎসরিক ২,০০,০০০৲ সাহায্যের প্রয়োজন)

গান্ধী ঐক্যতান

প্রায় ৭৫টি আবহ বাদ্যযন্ত্র ; ভক্তিমূলক ও স্বদেশপ্রীতি-মূলক রচনায় সুর-সংযোজন ; ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ড ; শুক্রবার সন্ধ্যায় ভজন : ঐক্যতান-সম্প্রদায়কে আত্মনির্ভরশীল কবিবাব জন্য ভ্রমণের ব্যবস্থা—
২,০০,০০০

গান্ধী সংরক্ষণাগার

চিত্র, ভিত্তি-চিত্র, কাঠ-খোদাই, মূর্তি, আবক্ষ প্রতিমূর্তি, উপহার-পত্র, গান্ধীয় বিপ্লবেব দৃশ্যাবলী, নৈতিক আদর্শবাদ-পরিচায়ক চিত্র, ক্ষুদ্রাকৃতি অঙ্কন, রাজনৈতিক দলিলপত্রাদি, চিঠি, আলোকচিত্র, গান্ধীজীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, দৈনন্দিন আশ্রম-জীবনের চিত্র ও আলেখ্য, হস্তলিখিত রচনাবলী, পুস্তকাদিব প্রথম সংস্করণ।

গৃহটি স্থাপত্যের নব আঙ্গিকের পরিচায়ক হইবে—৫০,০০,০০০

(রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাৎসরিক ১,০০,০০০৲ সাহায্য এবং আরও অর্থ-সংগ্রহ)

গান্ধী নৃত্য-সম্প্রদায়

গান্ধী-পরিকল্পিত নব নৈতিক ও সামাজিক বোধকে নৃত্যনাট্যের মধ্যে রূপায়িত করিতে হইবে।

পরিচ্ছদ, শিল্পিগোষ্ঠী, ভ্রাম্যমান মঞ্চ

(বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শন-ব্যবস্থার দ্বারা ইহা আত্মনির্ভরশীল হইবে) ২,০০,০০০

সমাজ-সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান

মহিলা শাখা

গৃহস্থালী-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ; মানবীয়-তত্ত্ব, সংগীত ও সেবা, হস্তশিল্প, ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন। নারী-সম্পর্কিত সমস্যা সম্বন্ধে

গবেষণা, কৃষ্টি শিল্পাগার, কল্যাণকর্ম-কেন্দ্র, সাময়িক পত্রিকা, ব্যায়াম ও খেলাধূলা, অভিনয়, সন্তানপালন বিষয়ে বক্তৃতা ইত্যাদি— ১০,০০,০০০৲

ছাত্র শাখা

ছাত্র সংঘ, গণ-সংস্কৃতি ও গণ-সংযোগের পরীক্ষাগার, বিচার সভা, যুব-সম্মেলন, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পার্লামেণ্টের অনুকৃতি, গ্রীষ্ম-শিবির, সেবা-উপনিবেশ— ... ... ১০,০০,০০০৲

শিশু-আগার, উপহার পুস্তকাদি, খেলনা, মুক্ত বায়ুতে বিদ্যালয় ও শিবির ইত্যাদি— ... ... ২,০০,০০০৲

প্রকাশনী

রঙীন চিত্রের জন্য অফ্-সেট্ মুদ্রাযন্ত্র— ... ৭,০০,০০০৲

(চিত্র, প্রাচীর চিত্র, শিরালঙ্কৃতি ইত্যাদি)

২ লিনো যন্ত্র, ১ মনো, ১ ফ্ল্যাট এবং ৩ ট্রেডল যন্ত্র, শেলাই, বাঁধাই ইত্যাদি ৪,০০,০০০৲

ইংরাজী ও হিন্দীতে পত্রিকা

'দি গান্ধীয়ান্' ২,০০,০০০

পুস্তক (ব্যবসায়ে নিয়োগ), কাগজ, মুদ্রণ ইত্যাদি ২,০০,০০০

বাৎসরিক লাভ ৭,০০,০০০

গবেষণা

১০ জন লেখক কর্তৃক গান্ধীজীর জীবন, কাল এবং মানবপ্রকৃতি ও নিয়তির উপর তাঁহার দর্শনের প্রভাব সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য পুস্তক প্রণয়ন, গান্ধী-রচনাবলী ও গান্ধী-সম্পর্কিত সাহিত্য সংগ্রহ। গবেষণা-পাঠাগার। ২০,০০,০০০৲

(৩ বৎসরের জন্য গবেষক নিযুক্ত হইবে)

গান্ধী-সম্মেলন

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হইবে; মূল কেন্দ্র ব্যয়ভার বহন করিবে।

যাতায়াতের ব্যয়, সাহিত্য, প্রচার, শিল্পসজ্জা ইত্যাদি ৫,০০,০০০৲

ভ্রাম্যমান বক্তা

গান্ধীয় জীবন-দর্শন প্রচারের জন্য বিশেষ বিশেষ চিন্তাশীল ব্যক্তি ও রাজনীতিকদের বিদেশে প্রেরণ ২,০০,০০০৲

গান্ধী-দর্শনের অধ্যাপক-পদ

ভিয়েনা, প্যারিস, অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড, পিপিং ও টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ বৎসরের জন্য গান্ধী-দর্শনের অধ্যাপক পদ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ৬,০০,০০০৲

প্রতীক-শিল্প ও প্রচার

প্রাচীর চিত্র, বয়ন-শিল্প, আভ্যন্তরীন রূপসজ্জা ইত্যাদি ২,০০,০০০৲

সংগঠনকর্ম

নীতির ক্ষেত্র—অনুভূতির শিক্ষা; সমাজের ক্ষেত্র—সামাজিক ত্রুটি সংশোধন; অর্থনীতির ক্ষেত্র—কুটীর-শিল্পের প্রসার, স্বল্পমূল্য বৈদ্যুতিক শক্তি, উদার দান, বিনামূল্যে যন্ত্র-সম্পর্কিত সহায়তা ইত্যাদি ৫,০০,০০,০০০৲

বিদেশস্থ প্রতিষ্ঠান সমূহ

১০টি প্রতিষ্ঠানের পত্তন করিতে হইবে

১। অন্যান্য আধ্যাত্মিক আন্দোলনগুলির সহিত যোগাযোগ।

২। বিদেশীয় পত্রিকাদিতে বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ।

৩। মূল গান্ধীয় সত্যের ভিত্তিতে কাব্য, নাটক ও উপন্যাস রচনা করিতে শিল্পীদের উদ্বুদ্ধ করা।

৪। বিদেশীয় লেখক ও সমাজনেতারা যাহাতে ভারতবর্ষে আসিয়া গান্ধীয় দর্শন ও কৌশল শিক্ষা করিতে পারেন তাহার সুবন্দোবস্ত করা।

৫। গান্ধী-রচনাবলী এবং তাঁহার চিন্তাধারা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কীয় পুস্তকাদির সংগ্রহ সংরক্ষণ।

৬। চিত্র-প্রদর্শনের মাধ্যমে ভারতের পরিচিতি। ২০,০০,০০০৲

মূল কেন্দ্র

দিল্লীতে একটি সুন্দর ভবন	২০,০০,০০০৲
কর্মী-আবাস ও অতিথিশালা	৫,০০,০০০৲
বক্তৃতা-গৃহ ও মঞ্চ	১০,০০,০০০৲
	৩৫,০০,০০০৲

গান্ধী ইন্‌ষ্টিটিউট্‌

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মাননীয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

পৃষ্ঠপোষকগণ

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ
মাননীয় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল
ডাঃ এ্যালবার্ট স্বইট্‌জার
অধ্যাপক আইন্‌স্টাইন্‌
ডাঃ এম্‌, বিশ্বেশ্বরিয়া
ডাঃ সি, ভি, রমন
নিকোলাস বেরডিভ্‌
ডাঃ বেনেদেত্তো ক্রোচে
এম্‌, জাঁ পল সাত্রে
এম্‌, জ্যাকুয়ে মারিতেঁই
ডাঃ সি, জি, ইয়ুং
পার্ল এস্‌, বাক্‌
অল্ডাস হাক্সলি
ডাঃ রীন্‌হোল্ড নীভুর
শ্রীমাধবহরি আনে
অধ্যাপক হ্যান্স কেল্‌সেন
ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ
অধ্যাপক জর্জ ক্যাট্‌লিন
ডাঃ লিন্‌ য়ু টাং
ডাঃ হেনেস হোম্‌স

পরামর্শসভার সভাপতি

মাননীয় ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ

সহ-সভাপতিগণ

শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহেরু
ডাঃ বি, পট্টভি সীতারামাইয়া

সহ-সভাপতিগণ

আচার্য জে, বি, কৃপালানি
মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে
শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ
আচার্য বিনোবা ভাবে
ডাঃ আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার
শ্রী কে. এম্‌, মুন্সী
মাননীয় শ্রী আর, আর, দিবাকর
শ্রী কে, জি, মাশরুওয়ালা
ডাঃ জে, সি, কুমারাপ্পা
অধ্যাপক পি, এন্‌, ব্যানার্জি
ডাঃ জাকির হোসেন
ডাঃ কালিদাস নাগ
মাননীয় ডাঃ এ, এন্‌, সিংহ

সভ্যগণ

১। বিশ্বজনীন গান্ধীবাদ
শ্রী টি, প্রকাশম্‌

২। পুনর্গঠনের যুগে গান্ধীবাদ
অধ্যাপক কে, টি, শাহ্‌

৩। গান্ধীবাদ ও আত্মিক বিপ্লব
অধ্যাপক এম্‌, হিরণ্য

৪। গান্ধীবাদ ও ঐতিহ্যের মূল্য
ডাঃ পি, ভি, কানে

৫। বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম ও গান্ধীবাদ
অধ্যাপক রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার

৬। গান্ধীবাদ ও নেতৃত্ব

শ্রী বি, কে, নেহেরু

শ্রী কে, সি, রেড্ডি

শ্রী এইচ্, ভি, আর, আয়েঙ্গার

শ্রী কে, এস্, ভি, রমন

শ্রী এস্, এন্, মজুমদার

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ

৭। গান্ধীবাদ ও বৈজ্ঞানিক মানববাদ

ডাঃ মেঘনাদ সাহা

৮। গান্ধীজীর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা

ডাঃ তারাচাঁদ

৯। গান্ধীবাদ ও নব শিক্ষাপদ্ধতি

মাননীয় শ্রী বি, জি, খের

ডাঃ অমরনাথ ঝা

১০। গান্ধীবাদ ও নব দৃষ্টিভঙ্গী

অধ্যাপক বিনয় সরকার

১১ গান্ধীবাদের আন্তর্জাতীয়তা

ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

১২। গান্ধীয় সৌন্দর্যতত্ত্ব

ডাঃ জেমস্ কাজিন্‌স

১৩। গান্ধীবাদ ও ইতিহাস

ডাঃ যদুনাথ সরকার

১৪। সত্যাগ্রহের স্বরূপ ও কৌশল

মাননীয় শ্রী আর, আর, দিবাকর

ডাঃ এন্, এস্, হার্দ্দিকর

১৫। গান্ধীয় অর্থনীতি

অধ্যাপক সি, এন্, ভকিল

ডাঃ এল্, সি, জৈন

ডাঃ বি, ভি, নারায়ণস্বামী

১৬। গান্ধী-দর্শন

মাননীয় শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ

ডাঃ রানাডে

১৭। গান্ধীবাদ ও ভূতাত্ত্বিক রাজনীতি

ডাঃ পি, এন, ব্যানার্জি

১৮। গান্ধী-পরিকল্পিত বিশ্বরাষ্ট্র

অধ্যাপক মুকুন্দ্ বিহারী লাল

১৯। নব-গান্ধীবাদ

অধ্যাপক এস্, শ্রীকণ্ঠ শাস্ত্রী

২০। গান্ধীবাদ ও বামপন্থী আদর্শ

শ্রীফুলন প্রসাদ বর্মা

২১। গান্ধীবাদ ও নাগরিকতা শিক্ষা

মাদাম সোফিয়া ওয়াদিয়া

বিজয়নগরমের মহারাজকুমার

২২। গান্ধীবাদ ও নব প্রচার-কৌশল

শ্রীমতী কৃষ্ণা হাথী সিং

শ্রী এস্, কে, পাতিল

২৩। গঠনমূলক গান্ধীবাদ

ডাঃ পি, সি, ঘোষ

আচার্য কাকা কালেলকর

ডাঃ আযনায়কম্

শ্রীসতীশ দাশগুপ্ত

কুমারী আমতুস সালাম

শ্রীমতী শান্তি দেবী

ডাঃ সৌন্দ্রম রামচন্দ্রন্

শ্রীমতী যশোদারাম্মা দাসাপ্পা

অধ্যাপক জ্ঞান সাহা

২৪। গান্ধীবাদ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

অধ্যাপক গুরমুখ নিহাল সিং
ডাঃ ভি, কে, জন
অধ্যাপক পি, এ, ওয়াদিয়া
অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর
শ্রীফ্যাঙ্ক এণ্টনী

২৫। গান্ধীয় সমাজতত্ত্ব

ডাঃ এম্, ভি, গোপালস্বামী
ডাঃ ঘুরী
ডাঃ পি, এস, নাইডু

২৬। গান্ধীবাদ ও ফলিত মনস্তত্ত্ব

অধ্যাপক হরিপদ মাইতি

২৭। গান্ধীবাদ ও এশিয়ার ভাবধারা

অধ্যক্ষ জে, কে, চৌধুরী

২৮। গান্ধীবাদ ও কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান

মাননীয় ডাঃ বি, সি, রায়
ডাঃ লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র
ডাঃ সুশীলা নায়ার
ধর্মপ্রকাশ বি, এম, শ্রীনিবাসিয়া

২৯। গান্ধীবাদ ও য়ুরোপীয় ভাষাতত্ত্ব

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৩০। গান্ধীবাদ এবং আন্তর্জাতীয় আইন ও নীতি

জষ্টিস্ রাজামান্নার
অধ্যক্ষ বি, কে, সিংহ
অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

৩১। গান্ধীবাদ ও কৃষিসমস্যা

অধ্যাপক এন, জি, রঙ্গ

৩২। গান্ধীবাদ ও সাংবাদিকতা

মিঃ লুই ফিশার
শ্রী কে, শ্রীনিবাসন
শ্রী দেবদাস গান্ধী
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার
শ্রীএস্, সদানন্দ
শ্রী কে, রামা রাও
শ্রী আর, কে, প্রভু
ডাঃ শচীন সেন
শ্রীখাসা সুব্বারাও
শ্রীজি, ভি, কৃপানিধি
শ্রীসামলদাস গান্ধী

৩৩। গান্ধীয় বিশ্ব-দৃষ্টি

অধ্যাপক এ, আর, ওয়াদিয়া
ডাঃ এস্, দাশগুপ্ত
ডাঃ জাহাঙ্গীর চাব্
ডাঃ ডি, এম্, দত্ত
অধ্যাপক ডি, এস, শর্মা
অধ্যাপক হবীব
শ্রীমতী সুমতি তারানাথ
অধ্যাপক অনরুধ ঝা

৩৪। গান্ধীয় জীবন-দর্শন

শ্রী ডি, এফ, কারাকা
অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু
শ্রীমতী মীরা বেন
ডাঃ স্ট্যান্‌লি জোন্‌স্
ডাঃ এস, বি, হুদ্‌লিকর
শ্রীভেনকাটারামানি
অধ্যাপক আজমল খাঁ

৩৫। গান্ধীবাদ ও নারী আন্দোলন

অধ্যাপিকা করুণাকণা গুপ্তা

কুমারী বাণী গুপ্তা

কুমারী সীতাদেবী, বার-এট্-ল

শ্রীমতী যমুনাবাঈ হিরলেকর

৩৬। গান্ধীবাদ ও শ্রমিক আন্দোলন

শ্রীহরিহরনাথ শাস্ত্রী

ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৭। গান্ধীবাদ ও শিল্পপরিকল্পনা

ডাঃ জে, সি, ঘোষ

ডাঃ কে, আর, কৃষ্ণস্বামী

৩৮। গান্ধীবাদ ও নগর-পরিকল্পনা

ডাঃ কোয়েন্‌সবার্গার

৩৯। গান্ধীয় সংস্কৃতি

ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

ডাঃ এস্, কে, দে

ডাঃ বেলভালকর

ডাঃ সুখতনকর

শ্রী আর, কে, করঞ্জিয়া

ডাঃ রামকুমার বর্মা

অধ্যাপক ভি, সীতারামিয়া

ডাঃ এস্, ভি, রঙ্গাম্না

অধ্যাপক জগন্নাথপ্রসাদ মিশ্র

ডাঃ ডি, ব্রহ্মচারী শাস্ত্রী

পণ্ডিত ছবিনাথ পাণ্ডেয়

শ্রীঅজিত সিং

৪০। গান্ধীবাদ ও বন্দীনিবাস সংস্কার

ডাঃ এন্, এন্, নারায়ণ শাস্ত্রী

শ্রীনুরুল হক্

৪১। গান্ধী ঐক্যতান

শ্রীমতী শান্তা আপ্তে

শ্রীমতী যুথিকা রায়

শ্রীতিমিরবরণ

শ্রীঅনিল বিশ্বাস

শ্রীমতী বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার

শ্রীসুকৃতি সেন

৪২। গান্ধীয় ভক্তিমূলক সংগীত

শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী

পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোদকর

শ্রীমতী মণি শাহুকর

৪৩। গান্ধী পাঠাগার

ডাঃ এস্, আর রঙ্গনাথন

ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়

ডাঃ যোশী

শ্রীঅমরনাথ ব্যানার্জি

৪৪। গান্ধী সংরক্ষণাগার

শ্রীনন্দলাল বসু

অধ্যাপক ও, সি, গাঙ্গুলি

ডাঃ স্টেলা ক্রাম্‌রিশ

শ্রীভেঙ্কাটাপ্পা

অধ্যক্ষ ডি, পি, রায়চৌধুরী

শ্রী কে, এ, ওয়াগ

অধ্যক্ষ লালকাকা

শ্রীএস্, ভি, গুর্জর

অধ্যক্ষ রমেন চক্রবর্তি

শ্রী ভি, এ, মালী

শ্রীবেন্দ্রে

কুমারী এ্যাবজেলা ত্রিন্দাদে

শ্রীইন্দ্র দুগার

শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৪। গান্ধী সংরক্ষণাগার

ডাঃ ত্রিবিক্রম
ডাঃ ডি, জি, ব্যাস
শ্রীমতী অপর্ণা রায়

৪৫। গান্ধীয় প্রচার-শিল্প ও প্রতীকরূপ

ভন্‌ এফ্‌ এইচ, রলেডার্র

৪৬। গান্ধীয় প্রকাশনী

আচার্য শ্রীরামলোচন শরণ
শ্রীজি, আর, ভাতকল
শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ আয়ার
শ্রী মোরারজী পদম্‌সে
শ্রীতড়িৎকুমার চ্যাটার্জি
শ্রীমতী নীলিমা দেবী
শ্রী ই, এম্‌, ট্রেজারীওয়ালা
শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত
শ্রীদানী

৪৭। গান্ধী নৃত্য-কলা

শ্রীউদয়শঙ্কর
শ্রীরামগোপাল
শ্রীগোপীনাথ
শ্রীভাল্লাথোল
শ্রীমতী তারা চৌধুরী

৪৮। গান্ধীয় মঞ্চ ও পর্দা

শ্রীপৃথ্বীরাজ
শ্রীভি. এস্‌, বসন
আচার্য পি, কে আত্রে
শ্রী ডি, বি, ব্রোচা
শ্রীশিশির ভাদুড়ী

৪৯। গান্ধী যুব-সংঘ

শ্রীরাধারমণ
শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর
শ্রীরাভেশ্বর প্যাটেল
শ্রী আর, এন্‌, ঠাকুর
শ্রীযোগেন্দ্র প্রসাদ
শ্রীদেবীচরণ গুপ্ত
শ্রীরবি বর্ম্মা
শ্রীআপ্পারাও
শ্রীকুমার নারায়ণ সিং
কুমারী চন্দোয়ানসন্ত সিং
কুমারী নীলিমা সেনগুপ্তা
শ্রীপ্রভুবঞ্জন সেন

৫০। গান্ধীবাদ ও আদিবাসী

ডাঃ ভেরিয়ার এল্‌উইন্‌
শ্রী বি, এস্‌, মূর্তি
শ্রী সি, এম্‌, মানবালান্‌

৫১। ছোটদের গান্ধী

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী
শ্রীমতী নীলাক্ষী সেনগুপ্তা
শ্রীমতী বাসন্তী বাগচী

—কোষাধ্যক্ষ—

শ্রীব্রিজলাল নেহেরু

—সাধারণ সম্পাদক—

(গান্ধী সম্মেলনে নির্বাচিত হইবেন)

সম্পাদকগণ

(ক) গবেষণ

অধ্যাপক এস্ শ্রীকণ্ঠ শাস্ত্রী

(ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সমাজবৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি)

ডাঃ ভি, কে, আর, ভি, রাও (অর্থনীতি)

শ্রীপ্যারেলাল শর্মা (জীবনী)

ডাঃ কে. এস্, শেলভাস্কর (সৌন্দর্যতত্ত্ব ও সাহিত্য)

(খ) কৃষ্টি

অধ্যাপক মহাদেবী বর্মা

(যাদুঘর, ঐক্যতান ও সাহিত্য-উৎসব)

(গ) প্রচার

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

(বেতার, বক্তৃতা, সভা-সমিতি)

(ঘ) মহিলা শাখা

অধ্যক্ষ রাজরানী উইজ্

(ঙ) প্রকাশনী

শ্রী জি, রামচন্দ্রন্

ডাঃ অমিয় চক্রবর্তি (ইংরাজী)

অধ্যাপক শিবপূজন্ সহায় (হিন্দী)

(চ) প্রতিষ্ঠান

ডাঃ সিদ্ধান্ত

শ্রীমতী মণি শাহুকর

(বিদ্যায়তন, পাঠাগার, পরীক্ষাগার)

(ছ) সংগঠন কর্ম

শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী (নীতির ক্ষেত্র)

শ্রীমতী আশা দেবী (সমাজের ক্ষেত্র)

কুমারী সুশীলা পাই (অর্থনীতির ক্ষেত্র)

(জ) শাখা

ভারতবর্ষ—শ্রীমতী মৃদুলা সরাভাই

বিদেশ—কুমারী ইন্দিরা সরকার

(ঝ) এশিয়া সম্বন্ধীয়

অধ্যাপক প্রশান্ত রায়

(ঞ) কার্যালয় পরিচালনা

শ্রী সি, আর, ডি, মেনন্

সহ-সম্পাদকগণ

কুমারী সান্ত্বনা দাশগুপ্তা

কুমারী রঙ্গনায়কী রামস্বামী

কুমারী ব্রিজরাজ কাউর

শিল্পীগণ

শ্রীমতী রাণী চন্দ

শ্রীউপেন্দ্র মহারথী

কার্যনির্বাহক সমিতি

সভাপতি

ডাঃ এস্, রাধাকৃষ্ণন

সভ্যগণ

মাননীয় ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ

মাননীয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

মাননীয় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহেরু

ডাঃ আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার

মাননীয় শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ

শ্রী কে, এম্, মুন্সী

শ্রী কে, জি, মশ্রুওয়ালা

অধ্যাপক পি, এন্, ব্যানার্জি

সম্পাদক

আচার্য জে, বি, কৃপালনী

